এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষণার শিরোনাম :

প্রমথ চৌধুরীর গল্প – বিষয় ও শৈলী

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ রাজিয়া সুলতানা
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক ঃ

মোঃ আমীর হোসেন
রেজি নং ৩৮
শিক্ষাবর্ষ '৯৯-২০০০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মোঃ আমীর হোসেন রেজি নং ৩৮/১৯৯৯-২০০০, অভিসন্দর্ভটি 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় ও শৈলী' আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত ও উপস্থাপিত। জনাব মোঃ আমীর হোসেন প্রণীত 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় ও শৈলী' শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভের কোন অংশ পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণাঙ্গভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য কিংবা কোন প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং কোন অংশ অন্য কোথাও ছাপা হয়নি।

রাজিয়া সুলতানা ১৪.১২.০৭

436787

অধ্যাপক (অবঃ) ডঃ রাজিয়া সুলতানা
(বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(অবঃ)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ

পৃষ্ঠা নং

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

দেশকাল পরিচিতি ও প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তি জীবন। ৩-১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি। ১৭-৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে সাহিত্যচিন্তা ও সমাজ ভাবনা । ৪১-৭৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের গঠন প্রকৃতি ও শৈলী বিচার। ৭৬-১০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। ১০০-১২৭

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন/ উপসংহার। ১২৭-১৩৪

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ——— ——— ———। ১৩৪-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন ও দেশকাল পরিচিতি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।" রূপের রাজ্যে তিনি ছিলেন বরপুরুষ- সুন্দর অবয়বে, প্রশস্ত ললাটে, পরিচ্ছন্ন মুখে, খড়গাকৃতি নাসায় ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তার প্রমাণ ছিল। রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বররুচি- তার সাহিত্যের আভিজাত্যে তার স্বাক্ষর আছে"১। বাংলাদেশে প্রমথ চৌধুরী এক পরম বিস্ময়। প্রথমেই প্রশ্ন আসে এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটির বাড়ি কোথায়? প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি নিয়ে নানা মুনির নানা উত্তর রয়েছে। কেউ বলেছেন প্রমথ চৌধুরীর জন্মস্থান যশোহরে, কেউ বলেছেন তাঁর বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে, আবার কেউ কেউ এরূপ ধারণাও পোষণ করেছেন তার বাড়ি কলিকাতার কৃষ্ণনগরে। তাঁর ভাষা শিক্ষার মূলে তিনি আত্মকথায় বলেছেন, "আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছিল কৃষ্ণনগরে"। প্রমথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছেন যশোহরে, মানুষ হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। তার নিজের কথায় "বাড়ী বলতে আমি সেই স্থানই বুঝি, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের বাস"২। প্রমথ চৌধুরীর জন্ম যশোহরে হলেও স্মৃতি অতি ক্ষীণ এবং যশোহরকে কখনই তিনি আপন বলে স্বীকার করেননি। পিতৃ পুরুষের বাসভূমি পাবনা জেলার হরিপুর ও পিতার কর্মস্থল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এ দুই স্থানের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর জীবনে সবিশেষ বর্তমান। "আত্মকথা"য় তিনি বলেছেন, "আমি ছেলে বেলায় কৃষ্ণনগরেই বাস করতুম সাড়ে এগার মাস ও হরিপুরে বাস

436787

Dhaka University Institutional Repository

পনেরো দিন। কিন্তু হরিপুর আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম; তার মানসিক আবহাওয়াও"।

প্রমথ চৌধুরী "জুড়ি ও দৃশ্য" গল্পে স্বীকার করেছেন "আমরা পদ্মাপারের বাঙ্গাল"৩। কাজেই তার বাড়ি নিয়ে মত পার্থক্য থাকা সমীচীন নয়। হরিপুরের যে চিত্র তার "আত্মকথা"য় আছে, তা থেকে তার মনোজীবন, এমন কি দু' একটি গল্পেরও উপাদান পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক মননের মধ্যে নাগরিক মেজাজ যতই থাকুক না কেন, অনেকগুলি গল্পেই পুরাতন জীবন ধারার ছাপ আছে। জমিদার শাসিত অতীত কালের পল্লী বাংলার মোহ তার গল্প থেকে একেবারে অপসারিত করা সম্ভব হয়নি। তার নাগরিক মেজাজের সঙ্গে এই আপাত বিরোধী উপাদানটুকু অক্লেশে মিশে ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার মনে ও চরিত্রে শহরের ও পাড়াগাঁয়ের প্রভাব কতটা আছে বলতে পারিনে, তবে দুইয়ের কতকটা আছে। তার ফলে আমার মনে পরস্পর-বিরোধী সংস্কার থাকা সম্ভব"৪। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলি প্রসঙ্গে তার এই মূল্যবান স্বীকৃতিটি মনে রাখা প্রয়োজন। হরিপুর গ্রামে তিনি চৌধুরী পরিবারে যে চিত্র একেঁছেন, তাকে অনায়াসেই "আহুতি" গল্পটির বহিরাবরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। হরিপুরের ছাপ অবশ্য তার বেশী গল্পে নেই।

প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকাল কেটেছে কৃষ্ণনগরে, পাবনা ও বিহারে, প্রথম যৌবন কৃষ্ণনগরে ও কলকাতায়, মধ্য যৌবন কলকাতা ও বিলেতে এবং শেষ জীবন শান্তি নিকেতনে। বৈদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় অতি অল্প বয়সেই- বাড়িতেই বৈদেশিক সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল। পিতা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র- ইংরেজী বইয়ের বিরাট এক লাইব্রেরী ছিল তাঁর।

প্রমথ চৌধুরীর বই পড়া ও বই কেনার স্বভাব সেখান থেকেই গড়ে ওঠে। তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য।

Dhaka University Institutional Repository

লাইব্রেরীর আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন আর ইংরেজী নভেল পড়ার দীক্ষা পান তার সেজদা কুমুদ চৌধুরীর থেকে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এলেন। এরপর থেকে প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের ওপর সাহিত্যের সাত সমুদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ল। বড়দা আশোতোষ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সেই সূত্র ধরেই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আঠারো বছরের এই তীক্ষ্ণধী জিজ্ঞাসুর পরিচয়। এই সময়ে থেকে তার মানস-পরিণতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হল বলা যায়। সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলা- সংস্কৃতির এই তিনটি ধারার লালনে তার মনোজীবন বিকশিত হয়ে উঠেছিল। চৌধুরীদের মটস লেনের বাসা শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি সাহিত্যের হাতে খড়িও হ'ল এই সময় থেকেই। তার মানস সংগঠনের পক্ষে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান। ফরাসি সাহিত্য ও প্রাক র‍্যাফালাইট কবিদের কবিতা ও প্রাক-র‍্যাফালাইট শিল্পের সঙ্গেও তার পরিচয় হল, দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে এল। দাদা যে নূতন লেখকদের বই নিয়ে এসেছিলেন আমি পূর্বে কখনও তাদের নাম শুনিনি, যথা- রেসিটি ও সুইনবার্ণ প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্পর্কে প্রাক-র‍্যাফালাইট শিল্প এর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই।

দাদা বাড়ির আবহাওয়ায় নান্দনিক র্চচার প্রভাব ছিল। তাছাড়া এই কালেই তিনি জোড়া সাকোর অসাধারণ পরিবারটির নিকট সংস্পর্শে আসেন। উনিশ শতকের শেষ দু'দশকে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কাব্যলক্ষ্মীর যে নিত্য নূতন প্রসাধন চলছিল প্রমথ চৌধুরী তার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। "কাল্মীকি প্রতিভা" গীতিনাট্যটির স্মৃতি তাঁর তরুণ মনে রেখাপাত করেছিল। "উনিশ শতকীয় রেনেসা'র শেষ

Dhaka University Institutional Repository

রশ্মিটুকু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শেষ বারের মত শত শিখায় জ্বলে উঠেছিল। সঙ্গীত এবং সাহিত্যের অনলস চর্চা অসাধারণ মানসিক বিস্তৃতি, উদার নৈতিক জীবন দৃষ্টি সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিল"৫।

তাঁরা যাদবানন্দ কীর্তনীয়ার বংশধর এবং নবদ্বীপ শান্তিপুরের প্রতিবেশী হয়েও সঙ্গীত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তার মায়ের সঙ্গীত প্রিয়তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে তখন সঙ্গীত চর্চা হ'ত-দ্বিজেন্দ্র লালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন একজন বড় ওস্তাদ। উত্তরকালে প্রমথ চৌধুরী মার্গসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। বাল্যকালে এই সঙ্গীত পরিবেশই তাঁর কবিতার প্রেরণা। তিনি বলেছেন, "এ সব গানই গাওয়া হ'ত ওস্তাদী ঢংয়ে, ওস্তাদের মুন্সিয়ানা বাদ দিলে সে কালের বাংলা গানকে হিন্দী গানের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে। .....ফলে বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল বাঙ্গালায় যাকে বলে ওস্ত াদী ঢংয়ের গানে । আজ পর্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায়নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল"৬।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজ্ঞানের সাধনা প্রমথ চৌধুরীর শিল্পীজীবনের এক বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে তার অভিমতটিকে প্রবন্ধে ও গল্পে নানাভাবে বলেছেন। "যে রূপ চোখে দেখা যায় সে রূপের চিরকালই অনুরাগী তিনি"। ইন্দ্রিয় উপভোগের যে প্রত্যক্ষ জগৎ, সে জগতেই প্রমথ চৌধুরীর মানস বিহার; রূপ লোক তাঁর প্রার্থিত স্বর্গ । এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা স্মরণযোগ্য: "ইন্দ্রিজ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিনঃ কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র এবং এই সূত্রের রূপের জন্ম। "রূপের কথা" প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন- অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়"। ছোট গল্পে, বিশেষ করে নারী চরিত্র বর্ণনায় তাঁর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ চেতনতার বিচিত্র ভঙ্গি, বর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ও রেখা বিন্যাসের কুশলী স্বাক্ষর বিদ্যমান। এই ইন্দ্রিয় সম্ভোগ রূপ জ্ঞান ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আরো প্রখরতর হয়েছিল।

তিনি নিজেই বলেছেন-ঠাকুর পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি। রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে পরে চৌধুরী মহাশয় ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে বিবাহ করেন।

প্রমথ চৌধুরী "বীর বল" ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন এই নাম গ্রহণের পশ্চাতে তাঁর খেয়ালের চেয়েও বেশী ছিল বোধ হয় মনের বিশেষ ধরণের। বীরবল ছদ্মনামটি কেন গ্রহণ করেছেন, তাঁর উত্তর দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন- "আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবে চিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম"৭।

প্রকৃত অর্থে বীরবল কে ছিলেন? উত্তর হল- শাহান শা আকবর দিল্লীর শাসন কর্তা ছিলেন। রাজ্য সভাকে ঘিরে তার অনেক পাত্র-মিত্র ছিল। শাহান শা আকবরের নব রত্নের এক রত্ন হল বীরবল। সভাসদ বীরবলের সূক্ষ্ম চতুর রসিকতার অজস্র কাহিনী উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে-রসিকতা ও বাক-চাতুর্যের ইতিহাসে বীরবলের নাম এমন সুবিদিত যে পরবর্তীকালে অনেকে বীরবলের নামে অনেক অ-বীরবল রসিকতাও চালিয়ে দিয়েছিল।

বীরবলের চরিত্রের দু'টি গুণ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল-বীরবলের অনন্য সাধারণ প্রখর পরিহাসপ্রবণতা এবং যুক্তি ধর্মিতা। 'এ নামে দুটি স্পষ্ট গুণ আছে প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয় শ্রুতি মধুর। কিন্তু এইটুকু কৈফিয়ৎ বোধ হয় বীরবল নাম গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বীরবল সভাসদ ছিলেন ও রসিকতার ছলে সত্য কথা বলতেন এই দু'কারণেও তাঁর বীরবল নাম গ্রহণের সপক্ষে ছিল। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)

Dhaka University Institutional Repository

বাকচাতুর্য ও যুক্তিবাদী মনোভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। ইমোশনের চর্চা প্রমথ চৌধুরী করেননি, তিনি র‍্যাশনালিজম এর চর্চা করেছেন। স্যানিটি (কান্ডজ্ঞান), ক্ল্যারিটি(প্রসাদগুণ) ও রিজন (যুক্তি) আশ্রয় করলে জীবনে অনেক দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ কথা প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক আঁদ্রে মোরোয়া বলেছেন, The most civilised way of being sad is to be humorous. প্রমথ বাবু এ কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন "আমি বাঙ্গালী জাতির বিদূষকমাত্র তবে রসিকতাছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য আমি দেখতে পাই যে অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন। এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ। তিনি যুক্তিবাদী মনোভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। এই তীক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের আলোয় প্রমথ চৌধুরীর মনের চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালি জীবনে ইমোশনের অতিচর্চার ফলে মননশীলতার হানি হয়েছে এবং সে জন্য আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে জ্ঞানের ফসল ফলেনি। এই কারণে আমাদের মানসিক অধঃপতন ঘটেছে। এই অধঃপতন থেকে বাঙ্গালিমনকে রক্ষা করার জন্য প্রমথ চৌধুরী কলম ধরেছেন। প্রমথ চৌধুরী যে বীরবল, ভারতচন্দ্র, ফরাসী সাহিত্যিক ও ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রকারদের ভক্ত ছিলেন তা এ জন্য যে এদের রচনায় ইমোশন এর চর্চা নেই, রিজন বা যুক্তির প্রশ্রয় আছে।

তিনি আমাদের মানসিক যৌবনের চর্চা করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ শারীরিক যৌবনের চর্চা করেছে ও সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য এই যৌবনের জয়গানে ও তার অবসানে বিলাপে মুখরিত। 'সবুজপত্রে' তিনি ইউরোপীয় যৌবন- যা চিরস্থায়ী মানসিক যৌবন-তার চর্চা এবং ইউরোপীয় প্রাণের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আমাদের মন সর্বদা ঘুমিয়ে থাকে । তাকে জাগিয়ে তোলাই প্রমথ চৌধুরীর ও 'সবুজপত্রের' সাধনা। এ জন্যই তিনি সাহিত্য চর্চায় নেমেছেন। "সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়। কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগ্রত করে তোলা। প্রমথ চৌধুরী যুদ্ধ ঘোষ া করে বলেছেন "আমার নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে আলস্যকে ঔদাস্য বলে শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই"-৮।

প্রমথ চৌধুররীর রচনায় তাই মানসিক যৌবনের নিত্য মহোৎসব, সেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির রাজত্ব ইমোশন ও বোধির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। 'গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করার সাধনাই তাঁর জীবন সাধনা'-৯।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারত বর্ষের প্রধান প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন "সে দেশের লোক 'অজমরাবৎ' বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে। আমরা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম চিন্তা করি"-১০।

ইউরোপের জীবনাদর্শই তাঁর পছন্দ এবং বাঙ্গালি তার জীবনে একেই গ্রহণ করুক এই তাঁর একান্ত অভিলাষ।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যে হাসির চর্চা করেছেন। অতি কান্নার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য প্রমথ চৌধুরী প্রস্তাব করেছেনঃ "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে"-১১।

বাঙ্গালি বীরবল তাই কান্নার বদলে হাসির, সস্তা তরল রোমান্টিকতার বদলে মননশীলতার চর্চা করতে চেয়েছেন এবং নির্ভয়ে ঘোষণা করেছেন, "আশা করি, যে হাসতে জানেনা সেই

Dhaka University Institutional Repository

যে সাধু পুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এদেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি"-১২।

তিনি দু:খকে হাসির মোড়কে প্রকাশ করেছেন। শুধু প্রবন্ধে নয় তার গল্প, কাব্যগ্রন্থেও তার প্রমাণ রয়েছে। 'সনেট-পঞ্চাশ্যৎ' কাব্যগ্রন্থের 'হাসি ও কান্না' সনেটে: "সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল, কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল, আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি"।

প্রমথ বাবু বিদ্রূপের হাসিকে ভালবাসতেন। 'বড়বাবুর বড় দিন' গল্পে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার দুর্গে প্রমথ চৌধুরী ফাটল আবিষ্কার করেছেন। বড় বাবু ভবানী বাবুর সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারলেন না, তার কারণ তারঁ স্বভাবেই নিহিত । অত্যন্ত হাস্যকর অবস্থায় ফেলে বড় বাবুকে অপদস্থ করা হয়েছে। শেষকালে লেখক ঠাট্টা করে বলেছেন, "এ গল্পের মর্য্যাল এই যে, পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়,-এই হচ্ছে ভগবানের বিচার।" আসলে এই বিশুদ্ধ সামাজিক স্যাটায়ার এবং নীতিবাগীশদের পিঠে বীরবলের রূঢ় মন্তব্য।

প্রমথ চৌধুরী গৃহী হয়েও যথার্থ গৃহস্থ ছিলেন না। তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন না। তিনি পারিবারিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে খবর রাখতেন, সংসারের বিচিত্র সুখ দু:খের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তবে সাংসারিকতার বোঝাকে তিনি কখনও মন ও জীবনের ওপর চেপে বসতে দেননি। সংসারকে তিনি এড়িয়ে যেতেন না, এড়িয়ে যেতেন সাংসারিক তুচ্ছতাকে। বস্তুত, সংসারের যে দিকটায় নীচতা আছে, মিথ্যার কারসাজি আছে,প্রবঞ্চনা আছে, আছে মনের নিরানন্দ উপলব্ধি, তার মধ্যে আর যাই হোক, শ্রী নেই। সংসারের শ্রীহীন ভারসর্বস্ব দিকটাকে

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা করতেন প্রমথ চৌধুরী। নিঃসন্তান প্রমথ চৌধুরী শেষ বয়সে ভ্রাতুস্পুত্র কালী প্রসাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, তাকে পড়িয়েছিলেন, তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। সেই কালীপ্রসাদ যে দিন বিমানযুদ্ধে মারা গেলো, সেদিন প্রমথ চৌধুরীর মনে হলো, তাঁর জীবনের রস শুকিয়ে গেছে। স্নেহ-প্রেম ভালবাসা তার জীবনে কতখানি ছিলো, তাঁর বুদ্ধিগর্ভ সাহিত্য থেকে আন্দাজ করা কঠিন হলেও কালী প্রসাদের ঘটনায় তার একটু পরিচয় নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়। আসলে প্রমথ চৌধুরীর দুটি জীবনের মধ্যে সাংসারিক জীবনটা ছিলো এহো বাহ্য, তাঁর মনোজীবনটাই ছিল-তাঁর কাছে যথার্থ গ্রাহ্য। ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যের জীবনটাই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই- যেখানে সংসারের পাপতাপ, রোগশোক প্রবেশ করেনা, "যেখানে কাজের ভিতর শুধু শাস্ত্রচর্চা, যেখানে সুখ দুঃখ নেই-কেবল চির আনন্দ সে দেশে কল্পনায় কাকে না নিয়ে যায়"।

অর্থ চিন্তা প্রমথ চৌধুরীর কাছে নিরর্থক ছিলো না কিন্তু টাকাকড়ির চিন্তাকে তিনি কখনও মনে ঠাঁই দেননি। সাংসারিক লাভালাভ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রমথ চৌধুরীর মনোভঙ্গীর পরিপন্থি ছিল। কৃতবিদ্যা হওয়া সত্ত্বেও পরের চাকুরীতে মন বসেনি। সরকারী বৃত্তি অযাচিতভাবে তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে রাজি হননি। বস্তুতঃ Practical man বলে যে গালভরা কথাটি আছে তার প্রতি বরাবর অনিচ্ছা ছিল প্রমথ চৌধুর। লক্ষ্মীর সাধনা করতে তার আগ্রহ কোন দিন দেখা যায়নি। ব্যারিষ্টার হয়েও তিনি পসার সাজাননি। লিখতেন টাকার জন্য নয়-মনের খুশিতে। 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকা বের করলেন, তার পেছনে খাটলেন অবিশ্রান্ত। কিন্তু তার লাভ হওয়া দূরের কথা, বহু টাকা লোকসান হল। কিন্তু তার জন্য আপসোস করেননি কোনদিন। এ ধরণের মানুষই হলেন প্রমথ চৌধুরী, এই হল তার মনের স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

উদার ও সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর মধ্যে ধর্মের গোড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। চৌধুরী পরিবার যাদব কীর্তনিয়ার বংশধর হয়েও চিরকাল ভক্তিহীন, শ্যামরায়কে কুলদেবতা রেখেও বৈষ্ণব নন তারা। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। ছেলে বেলায় ধর্ম শিক্ষা পাননি প্রমথ চৌধুরী। পরিবার ছিল ধর্ম শিক্ষার প্রতিকূল, তেমনি প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকালের কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা পঞ্জিকা শাসিত ছিল না, ছিল না তাদের ধর্মের অন্ধসংস্কার। প্রমথ চৌধুরী তাই কোন ধর্ম-সংস্কার পাননি, পাননি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। তিনি ছেলে বেলায় মানসিক খোলা হাওয়ায় বাস করেছেন, তাই গড়তে পেরেছেন একখানি সংস্কার লেশহীন ঋজু মন ।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন গ্রন্থকীট। কৈশোর তার কেটেছে লাইব্রেরীর আবহাওয়ায়। তাঁর বাবার ছিল ইংরেজি বইয়ের এটা বিরাট সংগ্রহ-দেশ বিদেশের ইতিহাস, স্কটের উপন্যাস, শেক্সপীয়ার-মিল্টন-বায়রণের বই ছিল তার মধ্যে। এই গ্রন্থাগারের আনুকূল্যে ছেলে বেলাতেই প্রমথ চৌধুরীর ইংরেজী সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয়ে যায়। পরে অবশ্য তাঁর নিজেরই একটা লাইব্রেরী গড়ে ওঠে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের। সেখানেই তাঁর অধ্যয়নের দুরূহ সাধনায় সময় কাটত, তিনি দিনরাত মশগুল হয়ে থাকতেন। লেখা পড়া ছিল তার কাজ আর খেলা।

কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিল যথার্থ আর্টিষ্ট। তাদের মত প্রতিমা গড়তে অন্য প্রদেশের কুমোরেরা পারত না। সুন্দর প্রতিমা গড়াতো বড় শিল্পীর কাজ। কিন্তু কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা কেউ শিব গড়তে বাঁদর গড়ত না । প্রমথ চৌধুরী তাদের হাতের চমৎকার আহলাদী পুতুল দেখেছেন, যার দাম দু'পয়সা। ওর

Dhaka University Institutional Repository

ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে, যা দেখে হাসি পায়। মুখ ব্যাদান করে এ পুতুল লোককে হাসায় না, হাসায় গড়নের গুণে। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্যরস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুল নির্মাতাদের ছিল।

কৃষ্ণনগরে স্থাপত্যেরও সাক্ষাৎ পাই,-আর্কিটেকচার। রাজবাড়ির চকফটক অতি সুন্দর আর রাজবাড়ির পূঁজোর দালান ও নাটমন্দির চমৎকার। এ ক'টিই মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর লক্ষণ। এর তুল্য পূঁজোর দালান ও নাটমন্দির প্রমথ চৌধুরী অন্য কোথাও দেখেননি। বীরবলের শিল্পী-মন গঠনে এ সমস্তই সাহায্য করেছিল।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বাংলার নাগরিকতার ভাষ্যকার। তাঁর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ড্রয়িং রুম কিংবা ক্লাবঘর-দরজা বন্ধ। টেবিলের উপর ইতস্তত:বই ছড়ানো, দেওয়ালে রঙ্গীন শেডের নিচে বিজলী আলো জ্বলছে। সোফা কৌচে কিংবা ফরাসে আসর জমজমাট। চায়ের কাপে ঝড় উঠছে, শ্রোতা সুর্নিবাচিত, বক্তা প্রমথ চৌধুরী। বক্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি ও মননের কসরত আছে, সূক্ষ্ম যুক্তি তর্ক আছে, তীক্ষ্ণ বাক্যবান দিয়ে অতর্কিত আঘাতের চেষ্টা আছে, আছে তর্কসুলভ নানা অবান্তর কথার সমাবেশ। শ্রোতারা নির্বাক বটে, কিন্তু তাদের সম্ভাব্য যুক্তি নিয়ে লকড়ি খেলতে বক্তা কুণ্ঠিত নন। কিংবা বিচিত্র ধরণের নরনারীর বাকবিতন্ডায় আসরটি মুখর, কিন্তু সবচেয়ে বেশী শোনা যায় প্রমথ চৌধুরীর গলা।

এক কথায় আসরটি চন্ডিমন্ডপের নয়, এ যুগের নগরের ড্রয়িং রুম কিংবা ক্লাবঘরের। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'ফরমায়েসি গল্প' নামক রচনাটির কথা মনে পড়ে। তার পটভূমিকায় আছে কোন এক জমিদারের একটি বৈঠকখানা-কিন্তু আসলে বৈঠকখানাটি যে একটি ক্লাব ঘরেরই নামান্তর মাত্র, তা গল্পটি একটু মনোযোগের সঙ্গে পড়লেই ধরা পড়ে। আর চরিত্রগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

তর্ক বিতর্কের ধারা অনুসরণ করলে তাদের নাগরিক অধিবাসী বলেই ধারণা হয়।

প্রমথ বাবু ছিলেন জীবন রসিক সাধুপুরুষ। তিনি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের উত্তরসূরী। হাস্যরসিক প্রমথ বাবু বলতেন 'হাস্যকর যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিষ্ট ফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁন্স পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকদের লেখায় পাবেন। এর কারণ তার মতে হাসি জিনিসটাই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি'।-১৩

দেশকাল

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম বিষয়ক কাব্য ও রোমান্টিক কাহিনী কাব্যে ভাবাতিরেক ও অবাস্তবতার পরিচয় আছে। ভক্তিরস-মন্থর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের যে স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গতিশক্তি যেন স্থিমিত প্রায়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিতা, মঙ্গলকাব্য, ও অনুবাদ-সাহিত্য-এই ত্রিধারাই যে বিশেষ রসস্রোতে আন্দোলিত হয়েছে, সে রস আর যাই হোক, আবেগবিরল, পরিমার্জিত, বুদ্ধিধর্ম সেখান থেকে নির্বাসিত। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য অনেকাংশে যুক্তিতর্কের বাহন হয়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের এই নৈয়ায়িক মেজাজের যুগেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যক পিতৃপুরুষের সন্ধান মেলেনি। কারণ যুক্তিতর্ক এলেও আবেগের বন্যা রোধ করার মত ক্ষমতা তাঁর হয়নি। তাই কারণে-অকারণে বাস্পোচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-প্রবণতা তখনকার গদ্যের একটি সাধারণ ধর্ম ছিল। ঐ যুগের প্রবন্ধকারদের রচনায় গবেষণা ধর্ম ছিল প্রধান। পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বক্তব্যটিই ছিল প্রধান, সে যেমন ভাবেই হোক না কেন। ভূদেব মুখোপাধ্যয়ের প্রবন্ধের উপাদান ও বস্তু গুনের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনা নেই। কিন্তু সে তুলনায় বলার মাধ্যমটি দুর্বল। সে যুগের লেখক কী বিষয় লিখবেন তার সাধনাই করেছেন, কেমন ভাবে লিখবেন, তার দিকে তাঁদের তেমন নজর পড়েনি।

শুধু প্রাচীনকাল নয়, উনিশ শতকের সাহিত্যের সঙ্গে বিশ শতকের সাহিত্যের যে মূলগত প্রভেদ তার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর মনে চল্লিশ বছর আগে যে প্রশ্ন জেগেছিল, আমাদের সামনেও প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে সেই প্রশ্ন জেগেছে। তাই নব্য লেখকদের সামনে তিনি একালের সাহিত্যের যে স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তার মূল্য অনস্বীকার্য। "প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণ ধর্ম অবলম্বন করেছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু'চারজন লোকের দখলে ছিল যখন লেখা দূরে থাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন"-১৪(ক)। আসল কথা নব যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তিনি চেয়ে ছিলেন যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা করতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙ্গালি মানসিকতায় পরিবর্তনের নতুন ঢেউ তোলে।পাশ্চাত্য চিন্তা ধারার শুধু ভাবগত প্রভাবই নয়, তার বিচিত্র রূপ ও রীতির অনুসরণে প্রমথ চৌধুরী অগ্রগন্য। অবশ্য পাশ্চাত্য চিন্তা ধারা এবং রীতির অনুসন্ধান প্রমথ চৌধুরীর আগে কেউ করেননি এ কথা বললে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে ভুল হবে। প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তা ধারা, রূপ ও রীতি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে প্রমথ বাবুর 'সবুজ পত্র' আর বঙ্গিম বাবুর 'বঙ্গদশর্দন' দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে পার্থক্য কম নয়। বঙ্গিম চন্দ্র বলেছেন "বাঙ্গালী যে ইংরেজদের অনুসরণ করে ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা"। তা ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব-সাধনার একটি সমন্বয় সাধন করা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল্ । এ ক্ষেত্রে 'সবুজ পত্রের' দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। 'সবুজ পত্রের' মাধ্যমে চৌধুরী মহাশয় আমাদের তন্দ্রাতুর জরাগ্রস্ত মনকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই জাগরণের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চার কথাও বলেছেন তিনি- তবে ইউরোপীয় বহিরাঙ্গিক অনুকরণের ব্যর্থতার কথাও তিনি বলেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে জড়তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার মতো উপাদান আছে, কিন্তু সেই উপাদান যেন বাংলা সাহিত্যে পরগাছার ফুল-এর মতো শোভা না পায়- বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের সাথে যেন মিশে যায়। তিনি বলেছেন "আমাদের বাংলাঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাতসমুদ্রকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করতে হবে"-১৪(খ)। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোন সহজ সাধন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

তখনকার দিনের দেশ-কাল যুগোচিত বিবর্তনধারা ছিল বির্তকসঙ্কুল। বির্তকসঙ্কুল আবহাওয়ার দিনে নানা তর্ক-কন্টকিত বির্তকমূলক সমাজ ও সাহিত্যের নানা চিন্তার আলোড়নের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি মূল্যবান রচনায়,....."আজ আমরা যাকে বলছি প্রগতি সাহিত্য বা সমাজচেতন সাহিত্য তার তর্ক খুব প্রখর হয়ে উঠেছে, ঐতিতহাসিক কারণে। কিন্তু 'সবুজ পত্র' যখন প্রকাশ হচ্ছে সে তর্কের তখন অপ্রতুল ছিল না। মানুষের সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন-তার শ্রেণীভেদের, তার ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, তার রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎস এর । এ আলোচনা তখন বেশ চলছে, কারণ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ ও ভীষ্ম পর্ব। এ আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল মোটের উপর এই পরিবর্তনের পক্ষে"-১৫। 'সবুজ পত্র' সম্পাদকের

Dhaka University Institutional Repository

নবীন প্রত্যাশী মানসিকতার পরিচয় এই উক্তিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক বির্তক ছিল তুঙ্গে। চিরাচরিত ব্যবস্থার জায়গায় নতুন কিছু দেখা দিলেই নানা দিক থেকে সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ দেখা দেয়। বলা বাহুল্য 'সবুজ পত্রের' সঙ্গেও সমসাময়িক পত্র পত্রিকার বিরোধ ছিল। আজ বিরোধ মিটে গেছে, কিন্তু সে কালের বাংলা সাহিত্যের কতকগুলো ঐতিহাসিক মুহূর্ত এর মধ্যে আত্ম গোপন করে আছে। এই বিরোধের সবচেয়ে বড় কারণ হল 'সবুজ পত্রের' ভাবাদর্শ। 'সবুজ পত্রের' বিরোধী পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'মানসী' ও 'নারায়ণ' ছিল প্রধান। প্রমথ চৌধুরীর স্বরচিত ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি মূলত বিতর্ক থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। মাঝে মাঝে চৌধুরী মহাশয়ও এই বিরোধী দলের আক্রমণে বিপন্নবোধ করেছেন, কিন্তু সব সময়েই অভয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৎকালীন 'সবুজ পত্র' বিরোধীতার বিষয় রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে জানা যায়। "সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশী পড়বে-যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই যে তাদের মাথার উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে-তুমি বাজে লোককে কিছু বেশী ঠাঁই দিয়েও থাক- তার একটা কারণ তুমি .....তাদের দুর্বাক্যকে এখনো ভয় কর"-১৬। বাংলা সাহিত্যের অচলায়তন ভাঙ্গার ব্রত নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, মাথার উপর চির যৌবনের কবি রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পাণি। (আধুনিক মনন ও বিংশ শতাব্দীর নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত এখানে)। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আরও ব্যাপকভাবে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ করেন। পরবর্তীকালে রাধা কমল মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধকে অবলম্বন করে এই বিতর্কে যোগ দেন। 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় রাধা কমল বাবুর প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে বস্তুতন্ত্রতার

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক সংজ্ঞা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই বিরোধের মধ্যে তিনি একটি সমন্বয়সূত্রও আবিষ্কার করেজেন, "কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো রোমান্টিকদের দোষ, সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্‌টদের তেমনি দোষ, প্রমাণ এমিল জোলা। আকাশগঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকীনির পরিবর্তে খোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তাকে জীবন দান করা নয়। রাধা কমল বাবু অবশ্য এ জাতীয় রিয়ালিজমের পক্ষপাতী নন। কেননা তার মতে যেটি এদেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ নারায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান রোমান্স । এমিল জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল সরস্বতীকে আকাশ পুরী থেকে জোর করে মর্ত্যের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য"-১৭।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন তা থেকে সেই আমলের বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতিও বোঝা যায়। ১৩২৬-এ লেখা একখানা চিঠিতে দেখি, কবি কায়মনোবাক্যে 'সবুজ পত্রের' পাতায় নতুন লেখকের আর্বিভাব দাবি করেছেন, "কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন? 'সবুজ পত্রের' সভার পোনের আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কালব্যতিক্রম দোষ ঘটে"-১৮। সবুজ পত্রের যদি নতুন একদল লেখক সৃষ্টি না হ'ল তা হলে এর উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবে না। তার ওপর এর অধিকাংশ লেখাই রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর,.....রবীন্দ্রনাথের মনে মনে এই অবস্থাটা ভাল লাগেনি। পরবর্তী চিঠিতে বলেছেন, "সবুজ পত্র পড়ে খুশি হ'লুম। কিন্তু আরো লেখা চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখক সৃষ্টির বেশী দরকার। লেখাসৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশী দূর পর্যন্ত সবুজ পত্রের টান পৌচাঁচ্ছে না"-১৯। চিঠির এ ভাষা থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ের লেখক

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রতুলতার কথা। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর পাঠকসংখ্যা যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি তার পত্রিকার পাঠক সংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। এই কালে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'পত্র গুচ্ছ' সবুজ পত্রের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ-পরিচালিত 'মানসী' পত্রিকা প্রসঙ্গে কবি মাঝে মাঝে যে দু'একটি কৌতুহলী মন্তব্য করেছেন তা থেকেও তখনকার অবস্থাটা কিছুটা বোঝা যাবে, নাটোর মানসীর জন্য অত্যন্ত তাগিদ করছেন। জীবনের বাজে উপদ্রব্যের মধ্যে এই আর একটি উপসর্গ বাড়ল। ".....নাটোরকে তাঁর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার কি কোন রাস্তা আছে? আমার আশঙ্কা আছে 'মানসীতে' যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজ পত্রের সবুজে তাঁর চোখ জুড়তে নাও পারে-সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার কর"-২০। শুধু নবযুগে সাহিত্যে ইউরোপের গতিশীল মনের স্পর্শই লাগেনি, এ যুগের সাহিত্যভূমি তর্ক-কন্টকিত ও বাদ-প্রতিবাদমুখর। 'মানসী', 'নারায়ণ' ও 'মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় 'সবুজপত্র' বিরোধীতার যে পরিচয় আছে তা থেকে সে কালের সাহিত্যিক বাদ প্রতিবাদের স্বরূপ নির্ণয় দুরূহ নয় । শুধু ভাষা দর্শন নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েও বাদ-প্রতিবাদের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্র-বিরোধীতার সূত্র ধরেই এই বাদ-প্রতিবাদের শুরু হয়। "সবুজ পত্র প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে থেকেই বিপিনচন্দ্রপাল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ ছিল তাঁর সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন যোগ নেই। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সাধনাকেও তিনি বস্তুতন্ত্রহীন বলেছেন। 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা'(১৩১৮, চৈত্র) প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়"-২১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ পত্রিকা' 'সবুজ পত্রের' সম-

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িক-পত্রিকাটি মোটামুটি প্রাচীন ধারার বাহক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শের বিরুদ্ধে এই যুগে চিত্তরঞ্জনও লেখনী ধারন করেছিলেন। 'নারায়ণ পত্রিকায়' তিনি বাংলা-গীতি কবিতা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন-তাতে বাংলাকাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও দেশীয় ভাষার প্রশংসা করা হয়েছে। তরুণ কবিরাও যাতে সেই বহু-প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন, প্রকান্ত রে তার নির্দেশ ও তিনি দিয়েছেন। সবুজপত্র প্রকাশের সমকালীন সাহিত্যিক পরিবেশ থেকেই সবুজপত্র পত্রিকার বিরোধী মতবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা মোটেই দুরূহ নয়।

প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন ও দেশকাল আলোচনায় ভাষা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি বিচার-প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছে তাঁর ভাষা। এক সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভাষাকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোড়ন ও আন্দোলন হয়েছিল,সেই সময় এই যুদ্ধমান প্রবল দু' টি প্রতি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষের তিনি সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে আন্দোলন এত বেশী ব্যাপক-হয়ে উঠেছিল যে উত্তরকালেও অনেকের কাছে তিনি নব্যতন্ত্রী ভাষা-আন্দোলন নায়ক হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

ভাষা নিয়ে আন্দোলন প্রমথ চৌধুরীই প্রথম শুরু করেননি, তার আগে ও বহু বার এ বাগবিতন্ডা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,প্রমুখ যেমন সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন.....অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালি প্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', হরিদাসের 'গুপ্তকথায়', দীনবন্ধু-মাইকেলের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে মৌ..ক ভাষা চালাবার চেষ্ট হয়েছে। যখন সে চেষ্টাটাই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল সবুজপত্রের আমলে-তখনই সাধু ও মৌখিক ভাষার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন উঠতে পারে টেকচাঁদ ঠাকুর (আলালের ঘরের দুলাল) ও কালী প্রসন্ন সিংহের (হুতোম প্যাঁচার নকশা) ভাষা-আন্দোলনের চেয়ে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-আন্দোলনে এত গুরুত্ব বেশী কেন?

এর উত্তরে বলা যায়, আলাল ও হুতোম এসেছিল ভাষার পরিবর্তন-তরঙ্গের অবরোহনের দোলায়। পন্ডিতি ভাষার প্রতিক্রিয়ারূপেই টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্নে মৌখিক ভাষার আত্মপ্রকাশ। টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন পন্ডিতি ভাষার বিপরীত বৃত্তক্রান্তি দেখবার জন্যেই শ্রীহীন রূপহীন অথচ প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ মৌখিক ভাষার অবতারণা করলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'হুতোম' ও 'আলালের' ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা নয় এই দুইটি গ্রন্থে সংস্কৃত-ঘেষাঁ ভাষার স্পর্শে সর্ব-প্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে: শুধু তাই নয়, জোর করে চালানো হয়েছে চলতি ধাতুঃ আরবী-ফার্সী গ্রাম্য দেশী শব্দ, সমাস বর্জিত পদ, মৌখিক ভাষার বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ, কবি শেখর কালিদাস রায়ের ভাষায়-'এ যেন হরিজন উদ্ধারের পর্ব'। এ যেন গোড়ামি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চামার চন্ডাল সবারই গলায় পৈতা পরাইয়া দেওয়া। 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষার বাহ্যিক পরিপাট্য নেই, শুদ্ধ-সংযত শ্রী নেই। গভীর গম্ভীর ধ্বনি নেই, মার্জিত রসস্ফূর্তি নেই, নেই সর্ব গুণান্বিত রচনা ভঙ্গির শিল্প-সৌন্দর্য। কলকাতার সর্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা ও শহুরে ভাষাদ্বয়ের একটি হল খাস কলকাত্তাই বুলি, যাকে শহুরে ককনি ভাষা বলা যায়- যা শুধু আঞ্চলিক ভাষার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল। 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষা প্রধানত এই কলকাত্তাই ককনি ভিত্তিক ভাষা-যে জন্যই এর ভৌগোলিক সীমাও নির্দিষ্ট। তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাচুর্য, কথ্য ভাষার ইডিয়াম ব্যবহার, তৎসম শব্দ বর্জন প্রচেষ্টা, চলতি ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ দেওয়ার চেষ্ট করা হয়েছে-ফলে শব্দে বিকৃতি দোষও ঘটেছে। বঙ্কিম চন্দ্র এই যুগের ভাষা-সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' তার সশ্রদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন লাভ করে ছিল। সংস্কৃতানুকারিতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি, এই রূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষ বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। ইংরেজীতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়া ছিলেন এবং বুঝিয়া ছিলেন।.....যে ভাষার কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবুদ্ধি। "সেই দিন হইতে শুস্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল"-২২। 'আলালী' গদ্য ও 'হুতোমী' গদ্য এই দুই গদ্যকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'বাঙ্গালীর ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা"-২৩। চলতি ভাষার অনুরাগীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও একজন । "তাঁর ধর্মমূলক লেখায় যেমন তিনি চলতি গদ্যের অঙ্গীকার করেছিলেন তেমনি তিনি অন্য কেউ চলতি গদ্য গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন"-২৪। আর রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর চলতি ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বহু আগে থেকেই তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু লেখায় ('য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ছিন্ন পত্র' ইত্যাদি) চলতি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) রচনায় চলতি ভাষার অতি সরল ভঙ্গি অনায়াসে মাধুর্য লাভ করেছে। মনে রাখতে হবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার বেশ আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৫) 'শকুন্তলা' (১৮৯৫) ইত্যাদি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলা গদ্যের সূচনালগ্ন থেকে সাধুরীতির পাশাপাশি চলতি রীতির একটি ধারাও প্রবাহমান ছিল। তাহলে,চলতি রীতি যেখানে বাংলা গদ্যের ভূঁইফোড় নয়, সেখানে প্রমথ চৌধুরীকে এত বেশী মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে কেন? এর উত্তর কারো অজানা নয়-

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদের চলতি ভাষা চর্চা বিচ্ছিন্ন ও আংশিক প্রয়াসমাত্র, আর প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে রীতিমত একটি সর্বব্যাপী আন্দোলন, বিরামহীন একটি সংগ্রাম। তাঁরই নেতৃত্বে চলতি ভাষা যথার্থ অর্থে আন্দোলন হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় এবং নিজের আসন দাবী করে। প্রমথ চৌধুরী সাধু ভাষার পয়লা নম্বর শত্রু। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সময়-কালের বাংলা ভাষার পরিবর্তন কামনায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন জীবনব্যাপী। তাঁর মতে বর্তমান বাংলা ভাষা সংস্কৃতি শব্দের গুরুভারে ভারাক্রান্ত এবং ইংরেজী ভাষার অন্বয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। এইসব কুপ্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা তার প্রাণশক্তিকে হারাতে বসেছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ভাষার মৌখিক ভঙ্গিটি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন চলিত ভাষা বাংলা সাহিত্যের লেখ্য ভাষার স্তরে উন্নীত হোক।

বিশ শতকের শুরু থেকে প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য অনন্যমনা হয়ে ওঠেন। আমাদের সাধারণ ধারণা, বুঝি, সবুজপত্র প্রকাশকালে প্রমথ চৌধুরী চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়, ততদিনে সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি হয়েছে, কিন্তু সবুজপত্র বের হওয়ার আগেই চলতি ভাষার সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীর অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে সবুজপত্র পত্রিকা না থাকলে প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে চলতি ভাষার আন্দোলনকে শক্তি দেওয়া সম্ভব হতোনা কিংবা তাকে সার্থকতার স্তরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হতো না এবং তিনি চলতি ভাষার সমর্থক রূপে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীও গড়ে তুলতে পারতেন না।

বিজ্ঞাপনবিহীন এই উজ্জ্বল পত্রিকাটি বের হয়েছিল প্রধানত- আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে বাঙ্গালী চিত্তের যে মুক্তি ঘটেছে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু নব সাহিত্যের ভাষা যে চলিত হওয়াই উচিত সবুজপত্রের মুখপত্রে (সবুজপত্র বৈশাখ ১৩২১) নানা কথার ছলে তা বলে দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। "সে দিন চলিত ভাষার ঘোর বিরোধীতা যারা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই দলের সর্বশেষ সংযোজন হলেন মোহিতলাল মজুমদার"-২৫।

এদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে ঈর্ষালু ছিলেন এবং এরা দেখলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয় প্রমথ চৌধুরীর চলতি ভাষাকেই মেনে নিয়েছিলেন তখন দু'জনকেই এরা আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করলেন। এদেঁর সকলের বিরুদ্ধে লড়বার পূর্ণ ক্ষমতাও ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরীর যথেষ্ট ছিল।

তৎকালে পন্ডিতরা মনে করতেন গদ্যসাহিত্যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে উহা গুরুগম্ভীর ও তেজস্বীতা লাভ করে। প্রমথ চৌধুরী যদিও শব্দ ব্যবহারে মুখের কথার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি সংস্কৃতবহুল শব্দ গদ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এমনটি বলবার যথোপযুক্ত কারণ নেই। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয় বঙ্গিমের মতই অনেকটা সমর্থন করেছেন। কিন্তু যারা মনে করেন যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ওপরই খড়গ হস্ত ছিলেন, তারাও এক্ষেত্রে সুবিচার করেননি। ভাষার দেহপুষ্টির জন্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের উপযোগিতা তিনিও অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে যে বিধি নিষেধের কথা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য, "কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ স্বরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিস্কার করে ব্যক্ত হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়"-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার দেশকালের মধ্যেই নবীন চিন্তা ধারার বীজ ছিল। আধুনিক চিন্তাধারার, আধুনিক জিজ্ঞাসা বাহন হিসেবে সবুজপত্রের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাঙ্গালীর উনিশ শতকীয় সুস্থ সমৃদ্ধ জীবন চেতনার মর্মমূলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই আলোড়নকেই তীব্রতর করে তুলেছিল। ধ্রুব আদর্শের প্রতি প্রশ্নচঞ্চল মনোভাব, সংশয়বাদ, প্রচলিত জীবনাচরণের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি-এই যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্য। জড়তাবিহীন নবীন চিন্তা ধারায়, যুক্তি বুদ্ধির মার্জিত প্রতিফলনে, মননশীলতার মৌলিকত্বে 'সবুজপত্রের' তরুণতর লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক নব জীবনের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই তখনকার সাহিত্যিক অবস্থার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমাদের সমাজে যে পরিমান কর্ম বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাঁধা'। রবীন্দ্রনাথের এই বিক্ষোভ থেকেই তৎকালীন প্রগতিবাদীদের জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন জীবনাচরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয়ের স্নেহধন্য সহযোগী শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'এ দিকে ইউরোপীয় মহাসমর অপরদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন-এই দুয়ের টানাটানি সত্ত্বেও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতির চেষ্টা ব্যাহত হয়নি-এইটিই সুখের কথা'।

আমাদের সমাজে জীবন রসিকতার যে অভাব দেখা গিয়েছে সেই প্রসঙ্গে চৌধুরী মহাশয় যে শ্লেষোক্তি করেছেন, তা মূল্যবান, "তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। আমাদের বিশ্বাস যে কোনরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

মনের রং পেকে উঠবে। .....এরা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিতকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এ দেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান।....এদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিস্কৃত করে দিয়ে ছাকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না, প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না"-২৭।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস অত্যন্ত দুর্লভ। প্রমথ চৌধুরী যে শ্রেণীর হাস্যরস পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তাতে জীবন রসিকতার একটি বড়ো স্থান আছে। জীবনের একটি উজ্জ্বল ও প্রসন্নরূপ দেখেছেন তিনি, কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কার প্রবণতা ও নৈতিক দৃষ্টি সেই প্রসন্ন ও পরিপূর্ণ রূপটিই আচ্ছন্ন করেছে।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের সামাজিক জীবনের সেই জীবন বিধ্বংসী দুর্লক্ষণকে আঘাত হানতে চেয়েছেন, দূর করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর হাস্যরসের সঙ্গে এই শ্রেণীর জীবনাচরণের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরীর জীবন দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যাদর্শের এইখানে একটি নিগূঢ় মিল আছে। আসল কথা আমাদের জীবনের বহু অসঙ্গতি তাঁর চোখে পড়েছিল-পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ জীবনকাম্য ছিল।

ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে প্রমথ চৌধুরীর মজলিশে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যারা যোগ দিতেন তারাই 'সবুজপত্র' গড়ে তুলেন। এই অভিজাত বিদগ্ধ পরিবেশে যে আবহাওয়া বিরাজ করত, তা কোন দেশকালের গন্ডীতে সীমাদ্ধ ছিল না। নির্বিশেষ সংস্কৃতি সাধনাই এই মজলিশের একমাত্র সাধনা ছিল। এই মজলিশের চিন্তা-চেতনা থেকেই সেই সময়ের সাহিত্য সাধনার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সবুজপত্রীদের স্মৃতিচারণে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন- "সেই গোষ্ঠীর মধ্যে যাদের কথা আমার বিশেষ মনে আছে তাদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীত কৃষ্ণ দেব, বরদাচারণ গুপ্ত, সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্রোপাধ্যায় এঁরা সবাই সংস্কৃত জীবনে প্রথিত যশা হয়েছে"-২৮। এঁদের লেখার মূল সুর এক তা হল মননশীল যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ আলোচনার সুর।

কেবল বেগসঁ, প্ল্যাঙ্ক ও রাসেল নয় এই সঙ্গে'শ, ক্রোচে, ফ্রয়েড, য়ং, অ্যাডলার, অয়কেন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বিষয়ক মননশীল আলোচনায় সবুজপত্রীরা মনোযোগ নিবন্ধ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা হল:তা মননশীল আলোচনার ধারা।

বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৪-১৯১৯ ও ১৯৩৯-১৯৪৫ কাল পরিসীমা দুটি স্মরণীয় অধ্যায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। ক্ষুধা আর অভাব ছিল মানুষের নিত্য সাথী, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মানুষ হয়েছে দিশেহারা, যেখানে উদরপূর্তির জন্য মানুষ হন্যে হয়েছে সেখানে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পরবে এটাই স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মানুষের বিবেক বসে থাকেনি, মুক্তির নেশায় মানুষ পথ খুঁজেছে বারংবার। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতায় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পঁচিশ বছরের পর্ব টিকে (১৯১২৪-১৯৩৯) নানা দিক থেকে সমৃদ্ধপর্ব বলে নির্দেশ করা যায়। (১৯১৪-১৯৩৯) এই পঁচিশ বছরের যে পর্ব, সে সময়ে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির আশ্রয়ের জন্য অভিযান চালিয়েছেন। রবীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্বে সাহিত্যে বিদ্রোহের ঝড়ো হাওয়া নিয়ে এলেন প্রমথ চৌধুরী । সাহিত্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার ও দুরূহ চিন্তার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়কে সহজ সরল করে উপস্থিত করার প্রয়াস তিনি করলেন। বুদ্ধিপ্রবন, মননশীল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার চর্চা, যুক্তি ধর্মীতা সবুজপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই কালপর্বে তিন শ্রেণীয় সাহিত্যপত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে রক্ষনশীল রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্র- 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ', 'নারায়ণ', 'বঙ্গবানী', 'বসুমতী'। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রবীন্দ্র গুণমুগ্ধ সাহিত্যপত্র- 'ভারতী', 'মনসী', ও 'মর্মবাণী, 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা'। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সাহিত্য আধুনিকতার পতাকাবাহী প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র- 'ধুমকেতু', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'শনিবারের চিঠি' ও 'পরিচয়'। শেযোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলির রবীন্দ্র বিরোধীতা রবীন্দ্র স্বীকৃতির নামান্তর এবং এদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধীতাও প্রবল।

রবীন্দ্রবিরোধী ও রবীন্দ্রভক্ত কোন গোষ্ঠীর সঙ্গেই সবুজপত্রের ঐক্য ঘটেনি বরং বিপরিতটাই ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্র ও সাহিত্যিকদের আক্রমণ থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যকে রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনুসারিতাও তাঁর কাম্য ছিল না। অপর পক্ষে 'কালিকলম'-'কল্লোল' এর জীবন-দর্শন ও তিনি গ্রহণ করেননি। 'শনিবারের চিঠি' যেমন 'কল্লোল'-'কালিকলম' এর অতিতারুণ্যকে তীব্র উপহাস করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধকেও আক্রমণ করেছে।

সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বাংলা কবিতা ও গল্প সাহিত্যে না পরার জন্য দু'জন দায়ী হতে পারেন-কবিতাক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কথা রাজ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহগামীরা কবিতা রাজ্যে যে পরিবেশ গড়ে তুললেন, তা একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন ও রোমান্টিক কাব্যসাধনাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে পরিগনিত হল। ফলে 'সনেটপঞ্চাশৎ' (১৯১৩) বা 'পদাচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থ দুটির যুক্তিভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি গ্রাহ্য কাব্যাবেদন বাঙ্গালি পাঠকের কাছে ব্যর্থ হল। 'কল্লোল' 'কালিকলম' এর আধুনিক কাব্য সাধনার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পল্লীকেন্দ্রিক ঐতিহ্যপ্রেমী ও ভগবদ বিশ্বাসী রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী জীবন দর্শনের প্রাধান্য ছিল। তারপর 'কল্লোল'-'কালিকলম' পত্রিকায় (১৯২৩-২৬) রবীন্দ্র কাব্য দর্শনের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেল। বিশ্বাস, আস্তিকতা রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে এল সন্দেহ, সংশয়, নৈরাশ্য, নাস্তিকতা ও বাস্তবমুখিতা। নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমার প্রমুখের কাব্যসাধনায় পেলাম দেহাতীত কল্পকামনার পরিবর্তে বাস্তবের ক্ষুধাতৃষ্ণার বন্দনা। পেলাম সচেতন দুঃখবাদ, আত্মদ্রোহীতা, রোমান্স-বিরোধিতা, পেলাম সচেতন রাজনৈতিক চেতনা, পেলাম গণমানুষের বিক্ষোভের কাব্যরূপ। ঐতিহ্যানুসৃতির স্থানে এল যুগ চেতনা, শান্তির পরিবর্তে সংশয়, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবের রূপায়ণ। কিন্তু কবি প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত আবেগরহিত মননকে এঁরা কাব্যের উপজীব্য বলে মেনে নিলেন না। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ তির্যক জীবন সমালোচনা-যা 'চার ইয়ারী কথা'য় (১৯১৬) দেখা গেল তা 'কল্লোল'-'কালিকলম' গোষ্ঠীর লেখকদের বা শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনি। শরৎচন্দ্রের মূলধন হৃদয়াবেগ, 'কল্লোল'-'কালিকলম' গোষ্ঠীর মূলধন রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দারিদ্রের আস্ফালন ও লালসার অসংযম'। প্রমথ চৌধুরী যেখানে'শ, রাসেল, বেগেঁসার ভক্ত সেখানে এঁরা স্কান্ডিনেভীয় কথা ও ইংরেজী গল্পকার অনুসারী। এঁদের আরাধ্য রোঁলা, হামসুন, জোহান, বেয়ার, হাক্সলি লরেন্স। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা-গল্পে বাঙ্গালিকে ভাবালুতা ও আবেগ প্রাধান্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং 'ভারতী'-

Dhaka University Institutional Repository

'মানসী' ও 'মর্মবাণী' 'কল্লোল'-'কালিকলম' গোষ্ঠী তাঁর সে সাধনাকে ব্যাহত করে দিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। জীবেন্দ্র সিংহ রায়- 'প্রমথ চৌধুরী' মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯৫৪ইং পৃঃ ১

২। প্রমথ চৌধুরী- 'আত্মকথা'

৩। প্রমথ চৌধুরী- 'গল্পসংগ্রহ'-বিশ্বভারতীগ্রন্থ বিতান, ১৩৪৮ বাং গল্প- 'জুড়ি ও দৃশ্য'-পৃঃ ৪২৩

৪। প্রাগুক্ত - 'আত্মকথা'

৫। রথীন্দ্রনাথ রায়- 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'-জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯ দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৬৯-পৃঃ ১৫

৬। প্রাগুক্ত-'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'-পৃঃ ১৩-১৪

৭। বীরবল, -নানা চর্চা

৮। প্রমথ চৌধুরী- প্রবন্ধ সংগ্রহ'-বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান-কলকাতা-১৯৫২ 'সবুজপত্রে মুখপত্র'-পৃঃ ৪২

৯। 'মহাভারত ও গীতা'-কার্তিক-১৩৩৪ বাং

১০। প্রাগুক্ত -'সবুজপত্রের মুখপত্র' পৃঃ ৪৬

১১। 'প্রাগুক্ত-খেয়াল পাতা'-পৃঃ-৪৪২

১২। প্রাগুক্ত -প্রবন্ধ সংগ্রহ-'ভারত চন্দ্র'-পৃঃ-২২০

১৩। প্রাগুক্ত-প্রবন্ধ সংগ্রহ 'ভারত চন্দ্র'-পৃঃ-২২০

১৪(ক)। প্রাগুক্ত- প্রবন্ধ সংগ্রহ- 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ'-পৃঃ-৩৪

১৪(খ)। প্রাগুক্ত-প্রবন্ধ সংগ্রহ 'সবুজপত্রের মুখপত্র' পৃঃ-৪৬

১৫। প্রাগুক্ত- প্রমথ চৌধুরী-প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকা- পৃঃ-১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিঠিপত্র'-পঞ্চম খন্ড; নং ৩৬

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খন্ড-নং ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১৭। প্রাগুক্ত প্রমথ চৌধুরী-প্রবন্ধ সংগ্রহ-'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি'-পৃঃ-৬৩

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খন্ড-নং ৭৮

১৯। প্রাগুক্ত -'চিঠিপত্র'-পঞ্চম খন্ড-নং ৭৯

২০। প্রাগুক্ত -'চিঠিপত্র'-পঞ্চম খন্ড-নং ১৯

২১। অজিত কুমার চক্রবর্তী এই প্রবন্ধটির উত্তরে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্চা কি বস্তুতন্ত্রহীন?- প্রবাসী ১৩১৯, আষাঢ়

২২। বাঙ্গালা ভাষাঃ বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খন্ড)

২৩। প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরী 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'- 'আমাদের ভাষা সংকট'-পৃঃ-২৮১

২৪। মনসুর মুসা সম্পাদিত বাংলা ভাষা-ঢাকা-১৯৭৭, পৃঃ-৫১

২৫। "আধুনিক সাহিত্যের ভাষা"-----'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (কলকাতা,-১৩৪৩ বাং)

২৬। প্রাগুক্ত -প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ'-'কথার কথা' পৃঃ-২৫৯

২৭। প্রাগুক্ত প্রমথ চৌধুরী'প্রবন্ধ সংগ্রহ-'সবুজপত্র' পৃঃ-৪৯

২৮। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'চলমান জীবন', প্রথম পর্ব -পৃঃ-২২০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি

সভ্যতার সূচনা এবং ভাষা শেখার শৈশব পর্ব থেকেই গল্পের জন্ম। লক্ষাধিক বছর আগে থেকে পৃথিবীর মানুষ তার মাতামহী বা পিতামহীর কাছে গল্পশুনত। কাজেই ছোটগল্পের জন্মমূলে আছে মানুষের গল্প বলা আর গল্প শোনার আদিম নেশা। তাই সব দেশের লোকগল্পে এবং লিখিত গল্পে প্রাচীন সাহিত্য-ই আদি পর্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট গল্পের বীজ।

পাশ্চাত্য সাহিত্য The old testament and the new testament are full of excellent short stories. ইটালীর বোক্কাচিও রচনায় দেকামেরন গ্রন্থটি আধুনিক ছোটগল্পের অঙ্কুরোদগম। সেই অঙ্কুর পেল ইংরেজী সাহিত্যে চসার (১৩৪০-১৪০০) এর ক্যান্টরবেরী টেলস এ। ইটালী থেকে ইংরেজী সাহিত্য হয়ে ছোট গল্প তার সার্বিক জন্মস্থান হিসেবে খুজেঁ পেল ফরাসী সাহিত্যকে। এভাবে বোক্কাচিও চসার, রবার্ট ইস্টভেন্স, রাবলেও সারভেন্তিস ছোট গল্পের সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিল।

কিন্তু ছোটগল্পের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান ফরাসী সাহিত্যের; তারপর রুশ ও ইংরেজী সাহিত্যের স্থান।

ফরাসী সাহিত্যে ক্রান্তিকালের ছোটগল্পের রূপায়িত হল আনাতল ফ্রান্সঁ, রোমাঁরলা, মার্শাল প্রুষ্ত প্রমুখর রচনায়। এদের পর এলেন অস্তিত্ববাদী লেখক গোষ্ঠী যার পুরোধা জাপঁল সার্ত্র।

উনিশ শতকে এসে রাশিয়া যে আধুনিক যুগের ছোঁয়াঁ পেল সে বার্তাকে সাহিত্যে রূপায়ণ করলেন আলেকজান্দার পুশকিন। ইউরোপের খ্যাতিমান লেখক তথা আধুনিক রুশ সাহিত্যের জন্ম দাতা পুশকিনের পরবর্তী নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-৫২) রুশ গল্পে আনলেন বস্তুধর্মীতা। ছোট গল্পকার

Dhaka University Institutional Repository

মোফাসাঁর পরেই সার্থকতম ছোটগল্পকার আন্তনচেখভের (১৮৬০-১৯০৪) স্থান।

ইংরেজী ছোটগল্পের প্রবর্তক হিসেবে ধরা হয় রবার্ট লুইস্টিভেনস (১৮৫০-৯৪) কে। অস্কার ওয়াইল্ডের (১৮৫৬-১৯০০) সুখী রাজপুত্র (Happy prince) বিশ্ববিখ্যাত। আন্তজার্তিক খ্যাতসম্পন্ন ওয়াশিংটন আরভিং (১৭৮৩-৫৯) এর নকশায় ছোটকগল্পের যে বীজ নিহিত ছিল তাই স্পষ্ট প্রকরণে রূপায়িত হল এডগার অ্যালেন পো (১৮০৯-৪৯) এর লেখনীতে। পো-র সমসাময়িক হলেন ন্যাথানিয়েল হর্থর(১৮০৪-৬৪) যার লেখনীয় মূল সুর মৃত্যুময় আধ্যাত্মিকতা ও হেনরীর

ছোটগল্পে

সাধারণ ঘটনার চমকপ্রদ সংস্থান রয়েছে। চরিত্র বিশ্লেষণের চেয়ে গল্পে চমক সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল।

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', গুনাঢ্য-র 'বৃহৎকথা', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ কথামঞ্জুরী', সোমদেবের 'কথা সরিৎসাগর', 'বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী', পারস্য ভাষায় রচিত 'আরব্য উপন্যাস', 'বাংলার রূপকথা', এমকি 'পূর্ব বঙ্গের গীতিকা' ছোটগল্পের বীজ বহন করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইহিমধ্যে দু'দুটো বিশ্ব যুদ্ধ ঘটে গেছে। মহাযুদ্ধে কোন ধর্মই মানুষকে বাঁচাতে পারেনি। মানুষ সংগ্রাম করে বেঁচেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হাজার হাজার যোদ্ধা ও শিশু মরল লক্ষ লক্ষ নারীকে করা হল ধর্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধে মানুষ সব কিছু হারাল, ধ্বংস হল মানুষের বিশ্বাস। কোন অলৌকিক শক্তিই মানুষকে বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সবার মনে হয়েছে কোন কিছুই পৃথিবীতে সত্য নয়, সত্য শুধু আমার বেঁচে থাকাটা। এটাই অস্তিত্ববাদ আজ বেঁচে আছি কাল কি হবে সে বলতে পারেনা। সে যদি

Dhaka University Institutional Repository

কোনভাবে বাঁচতে পারে সেটাই তার পরম ও চরম সার্থকতা। এই অস্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ পুরুষটি হল ফরাসী জ্যা পল সার্থ। পরে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে অস্তিত্ববাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। চেতনা প্রবাহ রীতির প্রকল্পক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বলেন আমি যে অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছি বর্তমান, এর অতীত নেই, ভবিষ্যত নেই। বিশের দশকে দেখা গেল নীচ শ্রেনীর মানুষও সংগ্রাম করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবে দেখা দিল শক্তি। ক্ষমতা যার হাতে সে শোষণ করতেও পারে এবং কল্যাণ করতেও পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সমরকালীন পূর্ববর্তী ফরাসী শিল্প বিপ্লব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। ১৭৮৯ সালে বিপ্লবের যে ঝড় উঠেছিল সেই হাওয়া সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল এমনকি এ পরিবর্তনের হাওয়া ভারতবর্ষের মানুষের পাঠকহৃদয়ে, শিক্ষিত সমাজ ও সাহিত্যে লাগে।

আবার পাশ্চাত্য রেঁনেসাস এর প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংঘটিত হয়ছিল সামান্য নবজাগরণ। নব জাগরণের ফলে শিল্প-সাহিত্যে ধর্ম চর্চায় সর্বত্র একটা বিপুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নতুন নতুন শিল্প আঙ্গিকে পূর্ণ হতে থাকে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনা। পঞ্চাশ-ষাটের দশকেই নাটক প্রহসন, মহাকাব্য, গীতি কবিতা, উপন্যাস রচিত হলেও ছোটগল্পের আর্বিভাব বিলম্বিত হয়েছিল শতাব্দীর শেষ দশক অবধি।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'গল্পের ভুবন', হেনা ক্যাথারিন লুমেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গল্পে এবং টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' এগুলোর মধ্যেও ছোট গল্পের বীজ নিহিত রয়েছে। "*উনিশ শতকের* নব্বইয়ের দশকেই যথাযথ অর্থে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রাশুরু এবং বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হচ্ছেন সে যাত্রার পথিকৃৎ। ২"।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে উনিশ শতকের প্রারম্ভে । শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত এই মধ্যশ্রেনীর সাধনাতেই সূচিত হয় বাংলা ছোটগল্পের "সমুদ্র সম্ভব বর্ণিল যাত্রা" ৩

"রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাত কুমার, প্রথম চৌধুরীকে পেরিয়ে বাংলা ছোটগল্পের স্রোত চলেছে নতুন পথে। তারাশংকর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম আর কল্লোল গোষ্ঠী, প্রবাসী, ভারত বর্ষ বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি গোষ্ঠী পেরিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব সমরকালে বাংলা ছোটগল্পের বিচিত্র বাকঁ নিয়েছে"৪। একবার নতুন গল্প লেখক এসেছিলেন নারায়ণ- নরেন্দ্রনাথ সন্তোষ কুমার-সমরেশ-জ্যোতিরিন্দ্র-রমাপদ-বিমলকর-ননীভৌমিক-সুশীলজানা-বারীন্দ্রনাথ দাস-প্রাণতোষ ঘটকেরা। পর পরেই এসেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার সহযাত্রী জগদীশ গুপ্ত আর সুবোধ ঘোষ। এই তিন গল্প লেখকই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা রহস্যময়তা, মানুষের মনোজগতের যে স্ববিরোধিতা, তাকে জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তারা কল্লোল-গোষ্ঠী বহির্ভূত। তারা চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত শূন্য। আবেগ বিষয়ে নির্বিকার শিল্প হিসেবে নিরাসক্ত, পরিবেশ সচেতন বিজ্ঞান বুদ্ধি সচেতন।

দ্বিতীয় বিশ্ব সমরকালীন গল্প লেখকদের সঙ্গে স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরবর্তী সময়ের এই সব গল্প লেখকের স্পষ্ট ব্যবধান আছে। ব্যবধান কেবল মন মানসিকতায় নয়-ভাষায় ও আঙ্গিকে, কেবল জীবন দৃষ্টিতে নয়, জীবনের নানা উপকরণের অভিনব ব্যবহারে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে ষাটের শুরুতে দেশ ভাগ হয়ে গেল বাংলা ছোটগল্পের নতুন আন্দোলন দেখা গেল, যার

Dhaka University Institutional Repository

মুখপাত্ররূপে প্রকাশিত হল "ছোটগল্পে নতুন রীতি" ৫। এই নীতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল কর।

ষাটের দশকে অপেক্ষাকৃত নবীন গল্প লেখকরা যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করে তাকে বলা হয়েছে, "শুদ্ধ গল্প, শাস্ত্র বিরোধী গল্প"৬। "ছোটগল্পের আকৃতি ও প্রকৃতির আমুল পরিবর্তন এনেছে ষাট দশকের ছোটগল্প লেখকরা। এই লেখকগণ পৃথক পৃথকভাবে এবং যুক্তভাবে ছোটগল্প সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারনার দ্বারা নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন বা ঘটবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। গল্পের কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছেন ব্যক্ত করণের ক্ষমতা দ্বারা । ব্যক্তকরণের ভাষাও আসছে অনুরূপভাবে। ছোটগল্প থেকে কাহিনী ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। তার কাহিনী বিন্যাস এবং নিজস্ব ভাষা রীতি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরে পুরোনো ছোটগল্প যেখানে কাহিনীর ভাষায় গল্পের ভাষা অন্তরীন ছিল, কাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার জন্য ছোটগল্পে গল্পের ভাষা মুক্তি পাচ্ছে। আন্তজীবনের অভিব্যক্তিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্পের ভাষা"৭।

বরং ষাট-সত্তর আশির দশকে সারা দেশে নৈরাশ্য, গণ-অভ্যুত্থান এবং সন্ত্রাসের পটভূমিতে উঠে এসেছে রাজনৈতিক চেতনা। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করছে যে তিন চারটি প্রধান গোষ্ঠী হিন্দু বৌদ্ধ, উপজাতীয়, আর মুসলমান, তাদেরকে নিয়ে লেখা গল্পের ঘাটতি আছে। তবু তারা শঙ্কর অচিন্তকুমার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু মুসলমান সমাজ ও চরিত্র নিয়ে লিখেছেন ছোটগল্প। দেশ বিভাগের অব্যবহিত আগে-পরে সদ্য হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি উঠে এসেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, মবিন উদ্দীন আহমেদ, শওকত ওসমান, আজিজুল হক, মাহবুব-উল আলম। এই সময়ের গল্প লেখকরা সমাজ সচেতন, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে স্তর বিন্যাস। ষাটের দশকের শেষ ও সত্তর দশকের শুরুতে যে

Dhaka University Institutional Repository

তরুণগল্প লেখকরা তাদের সকলের গল্পেই সর্বহারা শ্রেনী আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

নব্য শিক্ষিত এই সাধু পুরুষদের মধ্যে দেখা দেয় মত পার্থক্য। ঢাকা শহর কেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মর্মমূলে সামন্ত-মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজ সংগঠনের চিন্তা চেতনা উদার মানবতা বোধ এবং যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে গঠিত হল মুসলিম সাহিত্য সমাজ। অপর দিকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী লেখক ও শিল্পীরা গঠন করল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।(১৯৩৯)।

অর্থাৎ প্রাক সাতচল্লিশ পর্বে পূর্ববঙ্গের ছোটগাল্পিক চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছিল দু'টি ভিন্ন স্রোতে। একটি স্রোতের উৎস ছিলেন সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী গল্পকাররা অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথা কবিদের সাধনায়। প্রথম স্রোতটি নির্মাণ করেছেন মুহম্মদ মনসুর।

পটভূমি বলতে আমরা সাধারণত পশ্চাৎ ঘটনাবলীকে বুঝে থাকি। বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি বলতে আমরা নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলীকে ধরে থাকি।

ক) "চল্লিশের দশকে ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ উদ্বাস্তু, নতুন রাষ্ট্র গঠন, ভাষা আন্দোলনের সূচনা।

খ) পঞ্চাশের দশকে ঃ ভাষা আন্দোলন, নির্বাচন ও সাময়িক শাসনের উদ্ভব।

গ) ষাটের দশকেঃ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, মহাপ্রলয় ও নির্বাচন।

ঘ) সত্তর দশকে ঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব।

ঙ) আশির দশকে ঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন" ।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে বাংলা গল্পের সময় ছিল অত্যন্ত ঋদ্ধ। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ও বাংল ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবন, নগর জীবন, মনোবিশ্লেষণমূলক জীবন রাজনৈতিক চেতনা ও সমস্যার চিত্র, নারী জীবনের সমস্যা ভিত্তিক গল্প, যৌন-আকর্ষণ ও মূল্যবোধ সামাজিক সমস্যার চিত্র, পরাবাস্তববাদ, প্রভৃতি বিষয় বৈচিত্র দেখা দিয়েছে এবং সেই সাথে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ছোটগল্পের গাথুঁনী, ভাষা পেয়েছে গতিবেগ কাহিনীর চেয়ে কাহিনী বয়ণে গাল্পিকার হয়েছেন যত্নশীল।

তথ্যসূত্রঃ

১. ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী- 'বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ', পৃং ১৯

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ বাংলাদেশের ছোটগল্প-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা ছত্রিশ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা-সম্পা- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-পৃং ১৯১-১৯২

৩. প্রগুক্ত-বিশ্বজিৎ ঘোষ-বাংলাদেশের ছোটগল্প-পৃং ১৯২

৪. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়- 'বাংলা ছোটগল্প এই সময়'- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা-পয়ত্রিশবর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা-সম্পা-মোঃ মনিরুজ্জামান-পৃং-৩০

৫. প্রাগুক্ত- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়- বাংলা ছোটগল্প এই সময়- পৃং৩৩

৬. প্রাগুক্ত- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়- বাংলা ছোটগল্প এই সময়-পৃং ৩৩

৭. শোভন রায়ের নিবন্ধ ছোটগল্প ও ভাষা, ক্রান্তিক-সংকলন-শ্রাবণ ১৩৭৫/১৯৬৮

৮. ডঃ সায়েদা বানু- বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ-

অধ্যায়- ছোটগল্পের পটভূমি.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে সাহিত্যচিন্তা ও সমাজ ভাবনা

ক) সাহিত্য চিন্তাঃ

এক বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। দুই শতকের সম্মিলন ঘটেছে তাঁর জীবনে এবং সাহিত্যে। ফলে একদিকে পুরানো দিনের বিলীয়মান ছায়া, অন্যদিকে নতুন সাহিত্যবোধ তাঁর লেখনীতে প্রতিবিম্বিত। কিন্তু তাঁর লেখার বিষয়বস্তু যে ধরনেরই হোক না কেন, সেখানে যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন, তা-ই সাহিত্যে নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে; পাঠককে জোর করে হলেও ভাবিয়েছে এবং সেই ভাবনা যে জীবনের নতুন প্রচ্ছদরূপে আবির্ভূত, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তা যে সহজেই সমাজে, সাহিত্যে এবং জীবনে গৃহীত হয়েছে, তা নয়। মূলত নতুন কোন বোধ-বিন্যাস-যুক্তি-জ্ঞানই সমাজে সহজে গ্রাহ্য হয় না। তা হতে সময় লাগে, কখনো আন্দোলন লাগে।

নতুনের অগ্রপথিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর অবদান সাহিত্য-সমাজে প্রধানত দু'টি পর্যায়ে। এক ঃ ভাষার ভিন্নশৈলী নির্মাণে। দুই ঃ কলাকৈবল্যবাদী স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যচিন্তক হিসাবে।

প্রমথ বাবু সাহিত্য চিন্তা অন্যান্য সাহিত্য চিন্তার তুলনায় শক্তিশালী এবং ব্যতীক্রমধর্মী। সাহিত্যচিন্তক প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক—

সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিভিন্ন মত রয়েছে। সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মত ব্যাখ্যা করা যাক। প্রমথ চৌধুরীর মতটি 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে ফুটে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবিচারমূলক রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে (টমসন)Tomson সাহেবের অভিযোগ খন্ডনের জন্য প্রমথ বাবু 'চিত্রাঙ্গদা' রচনাটিকে আদিরসাত্মক(erotic) এবং অনৈতিক(emoral) বলে অবহিত করেছেন। এই অভিযোগের কড়া প্রতিবাদ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা' একটি স্বপ্নমাত্র, মানব মনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন"। ভাষার দিক থেকে এটি কীটস এর জাদুকরী ভাষার তুল্য। 'চিত্রাঙ্গদা' সামাজিক দিক দিয়ে নয় মানবিক দিক দিয়ে অসাধারণ একটি শিল্পকর্ম।

অশ্লীলতা যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে তবে সেটি সাহিত্যে গ্রহণীয়। খোলামেলা জিনিসকে Artful করে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এর 'নষ্ট নীড়', (দেবর-ভাবীর প্রণয়), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক , পদ্মানদীর মাঝি এগুলো সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ কিন্তু মানবিক দিক থেকে অসামান্য ব্যাপার। সাহিত্যকে বিচার করতে হবে সাহিত্যের মানদন্ডে। প্রমথ বাবু beauty-এর ভক্ত, Utility এর অনুরক্ত নয়। সাহিত্য বুঝতে হলে সকল Bais (পক্ষপাতিত্বকে) বা পবিত্রাকে অতিক্রম করতে হবে।

সাহিত্যে কদাকার থাকবে কি থাকবেনা এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ গ্রন্থে সুন্দর ভাবে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে---"একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোন কবির লেখায় যদি পাই তাহলে বলব এ খবরটি দেবার মত বটে কিন্তু তারপরেই যদি বর্ননায় দেখি, ডেন্টিস এলো সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল---মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তাহলে বলতে হবে এটা খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার করতেই বিশেষ উৎসুক্য তাহলে সন্দেহ করব তারও মেজাজে পোকা পড়েছে ১" ।

ভাল লাগা যেমন সত্য, খারাপ লাগা-ও তেমনি সত্য, মুক্তোর মতো দন্তপঙক্তির সৌন্দর্য নিয়ে যদি কবিতা লেখা যায় তবে পোকা-পড়া দাঁতের কুশ্রীতাও কবিতার বিষয় হবে না কেন? কখনো হবে না তা নয়, কবি নিরাসক্ত চোখে দুটোকেই দেখবেন এবং দুটোকেই তার কাব্যে ঘোষণা করবেন। এতে কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়, আপত্তি ওঠে তখন, যখন দেখি এ যুগের অধিকাংশ কবি চারদিকে কেবল পোকাপড়া দাঁতই দেখতে পাচ্ছেন, কারো সুন্দর হাসি তাদের চোখে পড়ছে না।

শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকে ভয়ংকর ইয়াগোর চরিত্র বোধ করি সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নাই। তবু সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কৌশল মিলিয়ে এই চরিত্রটি এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে,পাঠক হৃদয়ে তার প্রতি ঘৃণা না জন্মে বরং ভাবের উদ্রেক করে। ভারতচন্দ্র রায় এর ভাড়ু দত্ত চরিত্রটি একই রূপে বর্ণনা করা যায়।শিল্পী এগুলোকে ভাবের ভাষায় এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেন, তখন এগুলো আর অসুন্দর থাকে না। সেটি সুন্দরের শিল্পরূপ ধারণ করে।

গভীর উপলব্ধি ও প্রকাশের দ্বারা অসুন্দরও সুন্দরে একাকার হয়ে যায়, তখন সেটি যে অসুন্দর তা বুঝবার উপায় থাকে না। সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও নির্মাণকৌশল মিলিয়ে যদি তা ভালো লাগে তবে কুৎসিত হলেও তা সুন্দর বা সত্য। আধুনিক কবি বলেছেন-" Truth is beauty, beauty is truth"2.

মন্দ কথা নিয়েও সাহিত্য রচিত হতে পারে যদি তা নিবিড় আনন্দ ও নিবিড় বেদনা দেয়। সত্যম-শিবম সুন্দরম। সত্য-সৌন্দর্য- সাহিত্যের মধ্যে এক অন্বয় রয়েছে।কিন্তু সাহিত্যের সত্য আর বাস্তব সত্য এক নয়। মানুষ উপলব্ধি দিয়ে সত্যকে জানে। সত্য কি? প্রমথ চৌধুরী বলেন সাহিত্য 'নিত্যবস্তু'।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব সত্যকে, সাহিত্যের সত্য অনেক ক্ষেত্রেই অতিক্রম করে। সেটা যদি গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায় সেটাই সাহিত্যিক সত্য। প্রমথ চৌধুরী সত্য প্রকাশে যে সাহিত্যিক মতবাদ তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। 'চার ইয়ারী কথা' 'বীনাবাই','মন্ত্রশক্তি', 'বোটনওলোটন', 'অ্যাডভেঞ্চার জলে','অবনী ভূষনের সাধনাসিদ্ধি'; 'নীল লোহিত', 'রাম ও শ্যাম' 'ফাস্টক্লাস ভূত'; 'ভূতের গল্প' ইত্যাদি গল্পে তাঁর সাহিত্য চিন্তা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তা শুধু প্রবন্ধেই নয়, গল্প সাহিত্যেও তাঁর চিন্তার বীজ নিহিত রয়েছে। 'অ্যাডভেঞ্চার জলে' গল্পটিতে জনৈক বন্ধু ভুতের গল্প বলছে---

"গল্পের সঙ্গে সত্য ঘটনার সম্পর্ক কি, এ নিয়ে অবশ্য মহা তর্ক আছে। কেউ বলেন, আর্ট সত্য ঘটনাকে অনুসরণ করে; আবার কেউ বলেন সত্য ঘটনা আর্টকে অনুসরণ করে। এ থেকে বোঝা যায়, আর্ট যে সত্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়, এ জ্ঞান সকলেরই আছে। অপর পক্ষে সত্য কথা আর্ট যে এক জিনিস নয়, এ কথা লোকেও মানতে বাধ্য।

আমি এখন একটি সত্য ঘটনার কথা বলব। লোকে তাকে সত্য বলে গ্রাহ্য করে কিনা তাতে কিছু আসে যায় না; সেটি গল্প বলে পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হয় কি না, সেটিই হচ্ছে বড় কথা। ঘটনা সত্য কি কল্পিত সে বিচার গল্প খোররা করে না"৩।

কোনটি সত্য কোনটি কল্পিত সেটি সাহিত্যের বিচার্য বিষয় নয়। প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ওটি মানুষকে আনন্দ দিতে পারল কিনা। এটিই প্রমথ চৌধুরীর কথা। এ কথার অনুসরণ মিলে 'ফাস্টক্লাস ভূত' গল্পটিতে।

"সারদাদাদা রোজ সন্ধে বেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সারদাদাদা যা বলে তার ষোল

Dhaka University Institutional Repository

আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাইনি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না; কিন্তু গল্পে দিবা রাত্র চলে"।

প্রমথ চৌধুরী বুঝতে চেয়েছেন সাহিত্য গড়বার ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, শ্লীল-অশ্লীলের ধার ধারে না। ইংরেজী সাহিত্যের প্রবর্তক ফীলডিং দম্ভভরে বলেছেন "গল্প উপন্যাসের রাজ্যে সমালোচকের কোন শাসন চলবে না। এ রাজ্যে আমি যা বলব, তাই হবে"। ফীলডিং এর এই দম্ভ যতটা অন্যায় শোনায় আসলে ততটা অন্যায় নয়। গল্প উপন্যাস সত্যই কোন সাহিত্য অনুশাসন মেনে চলে না। গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় না এমন কিছু ভূ-ভারতে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাহিত্য নির্মাণ ক্ষেত্রে সত্য-কল্পনা এবং সুন্দর-অসুন্দরের বিচারের ধার ধারেণনি। তাঁর সাহিত্য নামের প্রবন্ধ গ্রন্থে 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' ও 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধ দুটিতে এই ধারণার সুন্দর পরিস্ফুরণ ঘটেছে।

সৌন্দর্য বিশেষরূপে আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে উত্তেজিত করে এ কারণে তাহা বিশুদ্ধরূপে হৃদয়সম্পর্কীয়। ইহার যদি সত্য নাম দিতে চাও তবে ভাষার জটিলতা বাড়িয়া উঠিবে। নদী-অরন্য-পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার একটা বিভাগ হৃদয় সম্পর্কবর্জিত, এই জন্য সেই বিভাগটাকে আমরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু তাহার যে দিকটা আমাদের হৃদয় ভাবকে উত্তেজিত করে সে দিকে সত্য-মিথ্যা উচিত-অনুচিত নাই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত বা উচিত নয় এমন কোন কথা নাই।

"সৌন্দর্য মানুষের মন ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যগত একটা সমন্ধমাত্র। এ সমন্ধ সর্বকালে সর্বত্রসমান নহে। সেজন্যই সাধারণত বৈজ্ঞানিক কোঠা হতে দূরে রাখা হয়"৪। ভাবকে নিজের করে সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা, কুৎসিত-কদাকার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এবার আসা যাক সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক এর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতবাদের কথায়। সাহিত্যের দু'টি দিক আছে– বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে কোনোটিকে মুখ্য আর কোনোটিকে গৌন করে দেখেননি প্রমথ চৌধুরী। বস্তুতঃ সাহিত্যকে তিনি একটি মানুষ বলে মনে করতেন, আঙ্গিক তার দেহ, ভাব তার আত্মা। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার যেমন আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়, আবার তেমনি আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহেরও আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। আসলে একের অভাবে অপরে নিরর্থক। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন- 'যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার সৌন্দর্য আছে এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে' (অলংকারের সূত্রপাত্র প্রবন্ধে)।। অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমমূল্যে তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু প্রবন্ধ সাহিত্যে নয় প্রমথ বাবু সাহিত্যাদর্শ গল্পসাহিত্যেও ফুটে উঠেছে। "অবনী ভূষনের সাধনা ও সিদ্ধি" গল্পে প্যারীলালের মুখে প্রমথ চৌধুরী নিজের কণ্ঠকেই প্রতিস্থাপন করে ডাক্তার ও স্কুল মাষ্টারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- "তার মতে দেহ বাদ দিয়ে মানুষের মন গড়া যায় না, আর মন বাদ দিয়ে তার দেহ গড়া যায় না"৫।

প্রমথ চৌধুরী ল্যাটিন সাহিত্যসমালোচক লঙ্গিনুসের মত করে কথা বলেছেন। Sublime theury প্রনেতা লঙ্গিনুস ভাব ও রচনার মধ্যে যেন অভিন্নতা বিরাজ করে সে দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। বিষয় ও রচনারীতীর ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষাকে তিনি বিনীসূতোর মালায় গ্রথিত করতে চেয়েছেন।

সাহিত্য রচনা তখনই সার্থক, যখন উপযুক্ত বিষয় উপযুক্ত আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিয়ের বরণডালা চিত্রশোভিত না হলে তাতে বরণের ধান-দূর্বা রাখা চলে না; শিল্পীর ছবি আকঁবার রঙ নারকেলের মালায় রাখা অসঙ্গত। সৌন্দর্য মাত্রই সামঞ্জস্য নির্ভর। সাহিত্যসৌন্দর্যও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পারস্পারিক

Dhaka University Institutional Repository

সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই সার্থক সাহিত্য রচনা করতে হলে একদিকে বিষয়বস্তু ও অন্যদিকে আঙ্গিকের প্রসাধনের প্রতি সুন্দর দৃষ্টি দিতে হবে।,

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের এই দুই দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি ভাবের ঐশ্বর্যে ও আঙ্গিকের সৌন্দর্যে তাঁর রচনাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অন্যদিকে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সুসামঞ্জসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।তিনি বলেছেন ---"ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।কোথায় দেহের শেষ আর আত্মার সূত্রপাত হয় সে সম্পর্কে কোন দার্শনিকের জ্ঞান নেই"। এই উক্তির মধ্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সম্বন্ধ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সুসংহত মতের সর্বাধুনিক চিন্তারই পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক ক্রোচেও এই ধরনের মতই পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আঙ্গিককে তাঁর বিষয় থেকে পৃথক করে দেখার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন- "তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য দ্বারা ভাষার বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে-ইহাতেই সৃষ্টির নৈপূণ্য। ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা" ৬(ক)।

এই উক্তির মধ্যেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে পৃথক করে দেখার ইঙ্গিত আছে।

এবার আসা যাক সাহিত্যে প্রতিভা এবং অনুশীলনীর প্রভাব কতটুকু সে সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতবাদে। সাহিত্যকে অনেকে নৈসর্গিকী প্রতিভার ফল বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস, অনুশীলনের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না; বরং তার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য জন্মগত বা ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা থাকা চাই। শেলী, কীটস, প্রভৃতি কবিগণ এই মতের সমর্থক। শেলী কাব্য রচনার পশ্চাতে "Some invisible influence" কীটস "The magic hand change" দেখতে পেয়েছেন। আবার আরেক দল সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন ও চিন্তা স্বাপেক্ষ বলে মনে করতে দ্বিধা করেন না। তারা সাহিত্য সৃষ্টির মূলে দেবশক্তির প্রভাব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এই দু দলের আরেকটি দল আছে তারা মধ্যপন্থী; তাদের মতে, সাহিত্য একদিকে যেমন নৈসর্গিক প্রেরণার ফল অন্যদিকে তেমনি চর্চার উপর নির্ভরশীল। যাঁর সাহিত্য-রচনার ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা আছে অথচ চেষ্টা ও যত্ন নেই, তিনি কখনো যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জন্মগত সাহিত্য প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনাও সম্ভব বলে তাদের ধারণা।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যেমন নৈসর্গীক প্রেরণাকে স্বীকার করেছেন, তেমনি স্বীকার করেছেন সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তাকে। তিনি একদিকে বলেছেন- "সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়, তার স্থলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই"। অর্থাৎ নৈসর্গীক প্রতিভা থাকা চাই। অন্যদিকে বলেছেন- 'সাহিত্য সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। "সঙ্গীতের মত লেখা জিনিসটেও যে আর্ট এ জ্ঞান আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল। সকল আলংকারিক এক বাক্যে বলেছেন যে কাব্য রচনা করবার জন্য দু'টি জিনিষ চাই- প্রথমত প্রাক্তন সংস্কার; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা" ৬(খ)। প্রমথ চৌধুরীর এ বক্তব্য গল্পসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। 'রাম ও শ্যাম', 'মন্ত্রশক্তি', গল্প'র আলোকে এ বক্তব্যের স্বপক্ষে উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করা যায়। "বলাবাহুল্য নৈসর্গিক প্রতিভার বলে অচিরে রাম হয়ে উঠলেন একজন মহাবক্তা আর শ্যাম হয়ে উঠলেন একজন মহালেখক"৭।

Dhaka University Institutional Repository

যদি জিজ্ঞাসা কর যে তারা এই অতুল বাক্-শক্তির চর্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন, এক কথায় কোথায় তারা রিহার্সেল দিলেন- তার উত্তর, কলেজের ছাত্রদের কলকাতা শহরে যতরকম সভা-সমিতি আছে রাম তাতে অনবরত বক্তৃতা করতেন, এবং শ্যাম সে সবের লেখালেখির কাজ দুবেলা করতেন, তার উপরে নানা কাগজে নানা ছদ্ম নামে নানা সত্য মিথ্যা পত্রও লিখতেন।

এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টরূপে ও সুচারু ভাবে প্রমাণিত হয় যে 'রাম ও শ্যাম' গল্পে রাম ও শ্যাম ঐশ্বরিক প্রতিভার পাশাপাশি অনুশীলনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। যার ফলশ্রুতিতে দুই ভাই প্রথিতযশা সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হতে পেড়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে দেবশক্তির প্রভাবকে আরো গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছেন- "তোমরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করনা, কারণ আজকাল কেউ করে না কিন্তু আমি করি"। 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে ঈশ্বর লেঠেল একে একে সড়কি খেলায় মনিরুদ্দি ও হেদাৎউল্লাকে হারিয়ে দেয়। ঈশ্বর লেঠেলের লাঠির খেলার কসরত অদ্ভুত ও ভংকর। এরুপ লাঠিখেলা দেশের বরেণ্য ও খ্যাতিমান লাঠিয়ালরাও খেলতে জানে না।

গল্পকার প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য গড়বার জন্য দৈব শক্তিকে একটু বেশি জোড় দিয়েছেন পাশাপাশি সাধনা কেও কম গুরুত্ব দেননি। প্রমথ বাবু বলেছেন- "ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তারই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা ।শুধু লাঠি খেলাতে নয় পৃথিবীর সব খেলাতেই- যথা সাহিত্যের খেলাতে ,পলিটিক্সের খেলাতে, তিনিই দিগবিজয়ী হন যার শরীরে এই দৈব শক্তি ভর করে"৮। শুধু দৈব শক্তি থাকলেই হবে না কঠোর সাধনাও থাকতে হবে। 'বীনাবাই' গল্পে ঘোষাল সংগীত শীখতে যে গুরুজীর কাছে গিয়েছিল (বীনার কাছে) তিনি বলেছিলেন-

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হবেন"। আমি উত্তর করলুম এর অর্থ কি?
তিনি উত্তর করলেন "আপনাকে সংগীত সাধনা করতে হবে। একের সাধনায় অপরের সিদ্ধি হতে পারে না। প্রত্যেককেই নিজে সাধনা করতে হয়। আমি শুধু আপনার কানে সংগীতের মন্ত্র দেব। সে মন্ত্রের সাধন আপনাকেই করতে হবে"৯।

বীনাবাই এর কণ্ঠ ছিল ভগবদ্দত্ত তারপরও সে এক ব্রাহ্মণ সংগীতজ্ঞ এর কাছে গানের সাধনা করেন। এ বিষয়ে প্রমথ বাবুর মত মিমাংশিত যে সৃষ্টির মূলে অনুশীলন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দৈবশক্তি, এ দুয়ের সুসামঞ্জস্যে আর্দশ রচনা সম্ভব।

সাহিত্যের জন্মরহস্য সম্পর্কে সাহিত্যরসিকের কৌতুহল চিরন্তন। আদি কবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চীর শোকে আর্ত হয়ে যে শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন- "কিমিদংব্যবহৃতংময়া"১০। বস্তুতঃ যে সাহিত্য মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তা মানুষের মনের কোন রহস্যলোক থেকে আবির্ভূত হয়, সে কথা জানবার জন্যে অন্ততঃ রসিক জনের উৎসুক থাকাই স্বাভাবিক।

সাহিত্যের জন্মকথা সম্পর্কে 'বীরবলের হালখাতার' অন্তর্গত 'পত্র-২' নামক প্রবন্ধে আভাস পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর মতে দেহ ও মন নিয়ে মানুষের সত্তা। দেহ-মন একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। এই দেহের যেমন প্রাণ আছে তেমনি মনেরও প্রাণ আছে। দেহের প্রাণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়াই করে, মনের প্রাণ তার দীপ্ত আলোকে সমস্ত মনটাকে উদ্দীপ্ত ও উত্তপ্ত করে তোলে; বিশ্বের দিকে তাকে বিস্তৃত করে দিতে চায়। মানুষের দেহের কথা বাদ দিয়ে যদি মনের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায়- সাধারণ মাত্রেই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত; আর সাধারণের উর্ধে যারা তাদের মন

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূ র্ণভাবে জাগ্রত। মানুষের মনের এই পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থা থেকেই সাহিত্যের জন্ম হয়। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন- 'কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি'।

মানুষের দেহ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত; আর মানুষের জাগ্রত মন আত্মবিস্তৃত পথ সন্ধান করে, বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করতে চায়। সুতরাং মানুষের মনে নিঃসন্দেহে দুটি ইচ্ছা আছে- একটি জীবন ধারণের, অপরটি আত্মবিস্তৃতির। মানুষের মন যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছাও তার মধ্যে প্রবল হয় এবং সেই প্রবল ইচ্ছারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি হচ্ছে সাহিত্য। প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য "বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনতুন সম্পর্ক পাতানোই হচ্ছে কবি মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এমনকি কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি কবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই কথা হাজার লোকের মনের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে"১১।

সেই জন্যই প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'কবি মনের পরিপূর্ণতা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি'।অন্যত্র তিনি বলেছেন- সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ'। এই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মনের ব্যক্তিত্ব এবং মনের পরিপূর্ণতা বা পরিপূর্ণ জাগৃতি থেকেই এই মনের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়।

সাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকের ভিন্ন ধারণা বা মত রয়েছে। সতিশচন্দ্র বিদ্যাভূষনের মত আমাদেরও সাধারণ ভাবে একটা ধারণা আছে যে, মানুষের অমর হবার ইচ্ছা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। মানুষ মরণশীল। যে জীবনকে সে অতি যত্নে অতি ভালবাসায় গড়ে তোলে তাহা একদিন অনিবার্য ভাবে মৃত্যুর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে সাহিত্য অমর, তাই মানুষ অমর হবার ইচ্ছায় অনন্যোপায় হয়ে সাহিত্যকে আশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

করে। প্রমথ চৌধুরীর মতে এই ধরণের ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষের জীবন ধারণের আকাঙ্খার দিকটাই অমরত্বের অভিলাষী। অন্যদিকে মানুষের বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খাই সাহিত্যের উৎপত্তির মূল। সুতরাং মানুষের অমর হবার ইচ্ছার সঙ্গে সাহিত্যের উৎপত্তির কোনো কার্যকরণ সম্বন্ধ নেই। তাই প্রমথ চৌধুরীর নিজের মুখে শুনতে পাই- 'আর যা হতেই হোক অমর হবার ইচ্ছা থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় না'।

প্রমথ চৌধুরী গল্পসাহিত্যের কোথাও স্পষ্টভাবে সাহিত্যের জন্মগত কথা ব্যাখ্যা করেননি ,তবে তার বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে এ সম্পর্কে তার মতের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। "চার-ইয়ারী কথা" গল্পটিতে চৌধুরী মহাশয় স্বগোক্তি- "বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা নতুনভাবে মানুষ হয়ে ওঠেছিলাম। যে সকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে,তার বদলে দিনের আলোয় যা কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে তাই জেগে ও ফুটে ওঠেছিল"১২। কবি মন এই পরিবেশেই সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। এই ভাবের উদয় হতেই সাহিত্যের উদ্ভব।

'চার ইয়ারী গল্পে' প্রমথ চৌধুরী 'eternal feminine'১৩ বলতে বুঝিয়েছেন নারী চিরন্তনীকে শাশ্বত নারীকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে eternal ঐ রূপ বা শক্তিকে বোঝানো হয়েছে- যে শক্তি বলে সাহিত্যিককে সৃষ্টিলোকে সৃষ্টির জন্য টানে। স্বীকার্য যেহেতু বিশেষ কোন নারীর প্রতি জৈবিক আকর্ষণ নয়, নারীর মধ্যে মূর্ত সৌন্দর্যের ভাবসত্বের প্রতি আকর্ষণ যে আকর্ষণে মানুষ ভাবলোকে পদার্পন করে- ভাবের নেশায় গদগদ হয়ে সৃষ্টি করে সাহিত্য। যৌবনে পুরুষের সৌন্দর্যে ধ্যানমূর্ত হয় নারীর মধ্যে। "এই মায়ার প্রভাবে শুধু

Dhaka University Institutional Repository

বহি:জগতের নয়, আমার অন্ত জগতেরও সম্পূর্ণ রুপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহ মন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মুর্তি বাসনার আকার ধারণ করেছিল"১৪। এই বাসনাই সৃষ্টির বাসনা, ভালবাসার বাসনা, অন্তরজগতকে উন্মুক্ত করার বাসনা। এই ইচ্ছা শক্তিকে প্রমথ বাবু eternal feminine হিসেবে প্রকাশ করেছেন।

এই উক্তির পরিপোষক যে যুক্তি রয়েছে তা 'আহুতি' গল্পে অস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। "এই যাত্রার মুখে পুর্ব দিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। .....কলকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্ত রাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

আমার মন থেকে সব ভাবনাচিন্তা ঝরে গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মতো নির্বিকার ও প্রসন্নরূপ ধারণ করলে তার মধ্যে যা ছিল সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা"১৫। কবি ভাবনার এই পরিপূর্ণ আনন্দচিত্ত থেকে সাহিত্যের উদ্ভব হয়।- এটি প্রমথ চৌধুরীর অভিমত।

সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "অনবরত মানুষ আপনার চারিদিকে নিজেকে ছাড়াইয়া, নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা সংকীর্ণ সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টির দ্বারা নিজের এই যে বিস্তার রচনা করিতেছে সংসারের চারিদিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য"১৬। অন্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পর্কে যে মত পোষণ করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"জ্ঞানের কথা একবার জানিলেই আর জানিতে ইচ্ছে হয় না। যেমন আগুন গরম, সূর্য গোলাকার , জল তরল ইত্যাদি একবার জানিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কেহ যদি আমাদের কাছে নতুন শিক্ষার মত জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্ত বোধ হয় না"১৭। সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তা জীব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত আছে এবং থাকবে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূলে বিজ্ঞানের কথা গৌন, মূখ্য হল ভাবের বিষয় সমূহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বলেছেন- "মানুষের নানা চাওয়া আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়ার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার থেকে বড় চাওয়া বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থ্যাৎ মিলন চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্যে থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে"।

সাহিত্যের উৎপত্তির মূলে যেমন মানুষের একটা আত্ম-বিস্তৃতি আকাঙ্খা আছে, তেমনি তার উপাদানের একটা দিক আছে। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উপাদান হচ্ছে মানবজীবন ও প্রকৃতি। তবে মানবজীবনের নিতান্ত প্রাত্যহিক বস্তুগত রূপ নয়, তার ভাবগত শ্বাশত রূপই যে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। শাশ্বত শব্দটি প্রমথ চৌধুরী কোথাও ব্যবহার করেননি বটে, তবে সাহিত্যের সামগ্রীকে শ্বাশত বলেই যে তিনি মনে করতেন তার সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ-গল্প পাঠ করার পর সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।প্রমথ চৌধুরী মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে স্বীকার করেন না। "গল্পলেখা" গল্পে তিনি বলেছেন-" যা নিত্য ঘটে তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই তাই খাবার লোভে কে আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান"১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তার গল্পসাহিত্য আলোচনায় দেখা যায় প্রমথ চৌধুরী কল্পলোকের সত্য কথাকে প্রকাশ করেছেন। যেহেতু দৈনন্দিন জীবনকে তিনি প্রাধান্য দেননি তার অর্থ কি এই নয় যে, মানবজীবনের শাশ্বত অংশটুকু কেই তিনি সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে চান ? জীবন ও মন যে সাহিত্যের উপাদান হবে 'ফরমায়েশি গল্পে'ও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে " স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে, আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে। কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টা হয় তা হলে মানুষ কোনটা মেনে চলবে দুটোই। আমরা বলি রস এক তা কাব্যেরই হোক আর জীবনের হোক"১৯। এথেকে বোঝা যায় সাহিত্যের উপাদান প্রকৃতি ও জীবনমন। প্রমথ চৌধুরী জীবন গ্রন্থ থেকে কথা বস্তু সংগ্রহ করা যেমন পক্ষপাতি তেমনি বইয়ের পাতা থেকে। লেখাপড়া যাঁর পেশা কাজ আর খেলা তাঁর পক্ষে এটাই সুবিধাজনক পন্থা। সংসার জীবনেও ছায়া ফেলেছে তার মনের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ বর্জননীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা বাক্‌ছল"। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্ঠি লাভ করে। কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈহিক জীবন নয়, মানসিক জীবন। অন্যদিকে প্রকৃতিকে সাহিত্যের উপকরণ বলে স্বীকার করে নিতে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিধা নেই। তবে প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনশীল রূপের চেয়ে চিরন্তন শাশ্বত আদর্শ রূপ কেই যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতে হয়, তাতেও তার সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেছেন 'প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্য চিত্র রচনা করে'। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্ব শক্তি। অর্থাৎ মানব জীবনের মতই প্রকৃতিকে সাহিত্যের উপাদান করতে গিয়ে গ্রহণ বর্জন নীতি কে স্বীকার করে নিতে হয়। প্রকৃতির যেটুকু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করে মনের রূপ রস, সুখ-

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ, আশা আকাঙ্খা মিশিয়ে নতুন করে আর এক আদর্শগত শাশ্বত রূপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ "প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলা বিদ্যার কার্য নয়, কিন্তু তাকে আকৃতি দেইয়ায় হচ্ছে আর্টের ধর্ম। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে আমাদের মান সম্মত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতে হবেই এমন কোন নিয়মে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পরানো'। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনা অবসর নেই। শিল্পীরা কলা বিদ্যার অনন্যসাধারণ কঠিন বিধি নিষেধ মানতে বাধ্য। কিন্তু জ্যামিতি বা গণিত শাস্ত্রের শাসন নয়"। গল্প যে সায়েন্স নয় এটি যে আর্ট 'বীনাবাই' গল্পে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে-"গল্প সায়েন্স নয় আর্ট"২০। কাজেই আর্টের নিয়মেই সাহিত্য রচিত হবে এটিই প্রমথ চৌধুরীর অভিমত।

সাহিত্য গড়বার জন্য অনুকরণ সম্বন্ধীয় যে বক্তব্য চৌধুরী মহাশয় পেশ করেছেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে মতের সাথে অমিল প্রকাশ করেন নি এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমত পোষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'যাহা স্বভাব অনুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। যাহা প্রকৃত তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাহার ইচ্ছাধীন; সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূণ্য নবীন এবং স্পষ্ট হতে পারে। (প্রবন্ধ 'উত্তর চরিত')। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় বলেছেন-'প্রকৃত সৃষ্টি স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু তাহার প্রধান কাজ প্রত্যক্ষ সত্যকে অতিক্রম করিয়া অরূপকে রূপ দেওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানব হৃদয়ের কোমল, গভীর উন্নত অস্ফুট ভাবধারার সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতিকে মিলিয়ে সাহিত্য গড়ার জন্য মত প্রকাশ করেছেন। তবেই তা যথার্থ সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত

Dhaka University Institutional Repository

হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-'বাহিরের জগত আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে- তাহার সঙ্গে আমাদের ভাললাগা, মন্দলাগা, আমাদের বিস্ময়, আমাদের সুখ দুঃখ জড়িত। তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়ালই'।

" টাকা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিষ একই থাকে, শুধু তার ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে তার হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাংলা হবে"২১। 'গল্পলেখা' গল্পে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ প্রসঙ্গে এ কথা গুলোর অবতারণা করেছেন। এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় গ্রন্থের পাতা, বিরাট মানব জীবন ও প্রকৃতি থেকে উপযুক্ত উপাদান নির্বাচন করে নিতে হয় এবং সেই নির্বাচিত উপাদানকে মানসলোকে ব্যক্তিগত রূপ-রস, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা মিলিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিভার চরণে প্রমথ চৌধুরী শিকল পড়াতে নারাজ। গ্রন্থ, মানবজীবন ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্যকে আর্টের সত্যে পরিণত করা প্রয়োজন। কারণ "আর্টের সত্য এক, বিজ্ঞানের সত্য অপর। কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য নামক সত্যটি তেমন ধরা ছোয়ার বাইরে বলে সে সম্বন্ধে কোন রূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না।"

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী--প্রথম চৌধুরী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মত স্পষ্টভাবে ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

Dhaka University Institutional Repository

মতের মিল-অমিল দুই আছে। এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, প্রমথ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতালম্বী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের সেরা সাহিত্যিকদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ। তিনি একজন রূপান্তরিত মানুষ, আধুনিক চিন্তার লোক। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ, সমাজ, মানুষ সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করেছেন। 'বাঙলা নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন- 'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। বঙ্কিম বাবু সৌন্দর্যের মাধ্যমে উপযোগিতা সৃষ্টি বা নীতিজ্ঞান প্রচারের কথা বলেছেন। কলাকৈবল্যবাদী লেখকের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে আর্ট শুধু আর্টের নিয়মে রচিত হবে।কলাকৈবল্যেবাদী লেখক প্রমথ চৌধুরী এই ক্ষেত্রে সমাজ ও জীবন হিতৈষীবাদী লেখক বঙ্কিম চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের বিপরীত মার্গের পথিক। প্রত্যেক মানুষের কিছু বৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে। এই সহজাত প্রবৃত্তি এর পরিচর্যা করতে হবে। কিন্তু সামাজিক বিধি বা অনুশীলনীর যে সীমা আছে তা লঙ্ঘন করে নয়। বঙ্কিম বাবু এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে বলেন উপযোগিতাবাদ সাহিত্যে থাকা একান্ত অপরিহার্য। তিনি মনে করেন নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নীতিজ্ঞান প্রচার করতে হবে। এই দিক থেকে বঙ্কিমবাবু প্রাচীন রোমান সাহিত্যতাত্ত্বিক হোরেস এর নীতির অনুসারী। সাহিত্যতাত্ত্বিক হোরেস (খৃঃ পূঃ ৬৫ অব্দে জন্ম) মনে করেন কাব্য নির্মাণে কবির কাজ ২টি।

ক) লাভ বা উপযোগিতা সৃষ্টি করা এবং

খ) আনন্দ দান করা অথবা এই দুটো মিলিয়ে আনন্দদান যা থেকে আমরা জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিম বাবুও সাহিত্যের Artform/ শিল্পরূপের পাশাপাশি উপযোগিতার গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থ্যাৎ তিনি ঐ রূপ সাহিত্য রচনার কথা বলেছেন যে, সাহিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে থাকিবে দেশ, সমাজ সম্পর্কে কোন চিন্তামূলক, নীতিমূলক বা আদর্শগত দিক যা শিক্ষা লাভ করে মানুষের কল্যাণ বা দেশের উপকার করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার সুস্পষ্টমত বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া গেলেও গল্পসাহিত্যেও তার ছাপ রয়েছে। 'সারদাদাদার গল্প', 'সারদাদাদার সন্ন্যাস', 'ভাবনার কথা', 'সম্পাদক ও বন্ধু' প্রভৃতি গল্পে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় মন্তব্য রয়েছে।

সারদাদাদার সন্ন্যাস' গল্পে প্রমথবাবু সরাসরি বঙ্গিম চাটুজ্যের প্রতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন এই বলে যে- "যে গল্পের ভিতর কোনো শিক্ষা নেই, সে গল্প তার মতে বাজে গল্প। ছোটদা পড়তেন শুধু Smiles এর Self help এই বইটিই ছিল তাঁর বিলেতি হিতোপদেশ।

সারদাদাদা উত্তর করলেন, "আমি তো আর বঙ্কিম চাটুজ্যে নই যে, দেখেনি, শুনিনি, এমন গল্প মন থেকে বানিয়ে বলব আর হিজিবিজি জগৎসিংহ লিখব"২২? সাহিত্যের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অথবা উচিত নয় সে সম্পর্কে বঙ্কিম বাবুর মতকে কটাক্ষ করে প্রমথ বাবু বলতে চান সাহিত্যের উদ্দেশ্য কারো মনোরঞ্জন করা নয়। কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয় এবং কোনরূপ কার্য উদ্ধারের অভিপ্রায়ে সাহিত্য রচিত হওয়া অবাঞ্ছনীয়। কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দদান করা। ক্রীড়ার মধ্যে যে ধরণের নির্মল আনন্দ থাকে, কবির সৃষ্টির মূলে সেই আনন্দ ক্রীড়াশীল থাকে। কবির সৃষ্টি বিশ্ব সৃষ্টির মতো লীলাবিলাস মাত্র এবং 'সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায়ী নেই- সে সৃষ্টির মূলে অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ'। প্রমথ চৌধুরীর প্রকৃত কলাকৈবল্যবাদী লেখক। একমাত্র আনন্দ

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তিনি সাহিত্যে ভুরি ভোজন পছন্দ করেন না। 'নববাণী' নামে নতুন এক পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে জনৈক অনূপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কে লেখা এক পত্রে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন।" উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সাহিত্য প্রয়াসকে প্রমথ চৌধুরী উদ্দেশ্যমূলক, আনন্দহীন ও অসন্তোষপুষ্ট বলেছেন"। তার মতে উনিশ শতকের সব সাহিত্যিক জাতি গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন - "বঙ্কিমের লেখার যা কিছু মূল্য তা, জাতীয় শিক্ষা পুস্তক হিসেবে, আর্ট হিসেবে সেগুলোর খুব মূল্য নেই। সেই জন্যে তাঁর এই উক্তি "দুর্গেশ নন্দিনী ও মৃণালিনীর যুগে আর্ট তার কর আয়ত্ত হয়নি। আর আনন্দময়ী দেবী চৌধুরানীর যুগে আর্ট তার করচ্যুত হয়েছিল্"২৩। এমনকি বঙ্কিমের রোমান্সধর্মী রচনা প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না 'চার ইয়ারির কথা' ও 'ফরমায়েশি গল্পে'র ব্যাঙ্গাদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে?

ঐ পত্রে প্রমথ চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথকেও ঠুকছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে চরম আর্ট বললেও, তিনি রবীন্দ্রনাথের সব গদ্য লেখাকে এবং ছোট বড় গল্প গুলিকে উদ্দেশ্যমূলক বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য মানুষের মঙ্গল সাধন করে। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করেননি, তিনি তাকে সত্য সুন্দরেরই নামান্তর মনে করেছেন। তাই তাঁর মুখে শুনতে পাই 'কবিরা মঙ্গলকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য মূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন'। এ ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য (যেমন শিক্ষদান, ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন ইত্যাদি) আছে বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যঙ্গ করেছেন 'সারদাদাদার সত্য গল্পে'। প্রমথ বাবু সরাসরি

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে বলেছেন-" রবীন্দ্রনাথের মতো নবনব উন্মেস্রশালিনী বুদ্ধিতে আমি বঞ্চিত।
এ অবস্থায় এমন গল্প লেখন সম্ভব নয় যে কথা লোকের মনোরঞ্জন করবে। ফূর্তি যখন অন্তরে নেই তখন তা বাইরে প্রকাশ করব কি করে?"২৪
রবীন্দ্রনাথকে উন্মেষশালিনী বুদ্ধিবাদী হিসাবে আক্ষায়িত করে প্রমথ বাবু সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তার সারমর্ম হল লোকের মনোরঞ্জন সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় নিছক আনন্দ দানই হল সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'অবনীভূষনের সাধনা ও সিদ্ধিগল্পে' অবনীর সঙ্গীত সাধনা প্রসঙ্গে গুরুজী বলেছেন-"পরের মনোরঞ্জনার্থে বাজালে কেউ আর সঙ্গীত সাধনা করতে পারে না। কারণ তখন সে পেশাদার ওস্তাদ হয়ে পড়ে "২৫।
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধারণার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ধারণার খুব কি অমিল? প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন,"আমি যে আজ বাঙলা লেখক হয়েছি সে তার মনের আবহাওয়া বাস করে"২৬। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্যিকারের সাহিত্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ এবং এর যে রস তা অহেতুক। তিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্যবাদীদের ঠাট্টা করেছেন। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- "বিষয়ী লোক বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে বিষয়টা কি? কিন্তু লিখতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোন কথা নেই। বিষয় থাকেতো থাক, না থাকে তো নাই থাক, সাহিত্যের তাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। যে শিক্ষকের ঝুটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুন্ডিত মস্তক তাহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়। উদ্দেশ্য হাতড়াইতে গিয়া কিছু না কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়ি মাছ বাহির হইয়া পড়ে। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম-কোনো একটা বিশেষতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

নির্ণয় বা কোনা একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ অনুসারে তাহাকে দর্শন, বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর কিছু বলতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই"।

"সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেই রূপ সৃজনধর্মী, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায় সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতু চক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থকিয়া সাহিত্যে এই রূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়"২৭।

যদি কোন উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কী! গোটা কতক সন্দেশ খাইয়ে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্তি সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না। আনন্দই সাহিত্যের আদি-অন্ত-মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য আনন্দ স্বরূপের লীলাময় অভিব্যক্তি।'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধে (বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত, অগ্রাহায়ন,১৩১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানব চরিত্রের মধ্যে আনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে"২৮। সাহিত্য সৃজনের এই আনন্দতত্ত্ব প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্য খেলা' প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে। "সাহিত্যে মানবআত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে"২৯।

'সবুজপত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছিল-"স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনো-একটি অভাব পূরণ করা, কোনো

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়"৩০। এই সব উক্তি সাহিত্যের উদ্দেশ্যহীনতা ও সমাজনীতি আদর্শের সর্বপ্রকার স্পর্শ বিহীনতার তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ সেই আর্টই প্রমথ চৌধুরীর অনিষ্ট,যে আর্ট কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে না, কোন শিক্ষা দেবে না, রাজনীতিতে জড়াবে না, এবং কোন লোকহিত বা পরোপকারবৃত্তি অবলম্বন করবে না। এবার আসা যাক সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত কি? 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে এর মমাংসা করার চেষ্টা করেছেন যার প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় 'ভাবনার কথা' ছোটগল্পে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাস্তব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধের সমালোচনা করে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধটি লিখেন। রাধাকমল বাবুর প্রবন্ধের জবাবে প্রমথ চৌধুরী'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটি লিখেন। সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি এতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে প্রমথ চৌধুরী বস্তুতন্ত্র বলতে রাজি নন। সেজন্য সত্যের জ্ঞান হারিয়েছেন বলে তিনি এমিল জোলাকে জোর আক্রমণ করেছেন। বস্তুতন্ত্রতা সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে এই, এটি ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিস। রিয়েলিজম নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাতে বস্তুতন্ত্র নাম ধারণ করেছে। রিয়েলিজম প্রমথ চৌধুরীর পছন্দ নয়। এবং তাঁর মতে এ সাহিত্যতত্ত্ব নয়, সমাজতত্ত্ব। প্রমথ চৌধুরী সামাজিক মনকে অ্যাবষ্ট্রাক্শন বলতে চান এবং ধর্ম, কাব্য, আর্ট ইত্যাদি তাঁর মতে আধ্যাত্মিক ব্যাপার। প্রমথ চৌধুরী,বার্নার্ড'শর প্রতি কটাক্ষ করেছেন এই জন্য যে শ' Art for Art তত্ত্বের বিরোধী। ইবসেন ও শ'র নাটকে সামাজিক সমস্যার মিমাংসা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বলে প্রমথ চৌধুরী নির্ভয়ে বলতে চান, তাঁদের সাহিত্যে শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ শ্রী নেই। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক একটি সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য থেকে রিয়ালিজম বা আইডিয়ালিজম স্বতন্ত্র করে ছেঁকে দেখানো সম্ভব নয়-কারণ এ দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, "রিয়্যালিজমের পুতুল নাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন, তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রই একাধারে রিয়ালিষ্ট এবং আইডিয়ালিষ্ট"৩১। প্রবন্ধটির মধ্যে রিয়্যালিজমের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আইডিয়ালিজম যে রিয়্যালিজমের বিরোধী নয় বরং পরিপূরক। রিয়্যালিজমের উল্টোপিট হচ্ছে রোমান্টিসিজম। 'ভাবনার কথা' গল্পে প্রমথ বাবু বলেছেন " Facts এর জ্ঞান হচ্ছে Idealism এর প্রধান শত্রু তা তো আপনি মানেন "৩২। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন- 'ডিমোক্রাসির যুগে Utilitarianism সাধারণ মনের উপর রাজার মত প্রভূত্ব করে, সুতরাং সে যুগে যুক্তির বাণী হচ্ছে art for art sake যেমন Theorcracy-র যুগে মুক্তির বাণী হচ্ছে Truth for truth's sake"৩৩ অর্থাৎ লোকহিত চেতনার দিক দিয়ে নয়,সাহিত্যের মুক্তি ঘটবে কলাকৈবল্যবাদের পথ ধরে। সেইজন্য প্রমথ চৌধুরী উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের এবং ডেমোক্রাসির ও পলিটিক্সের দারুণ ক্রিটিক। প্রমথ চৌধুরী মনে করেন ডেমোক্রসির মহাদোষ হচ্ছে ইতরতা; সবাইকে সমান করার জঘন্যতা। ডেমোক্রাসি অসাধারনত্বের বিরোধী এবং বিরোধী বলেই কাব্য-কলারও বিরোধী; কারণ প্রমথ চৌধুরীর মতে, কাব্য ও কলা অসাধারণ ও অভিজাত মনের সৃষ্টি। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে রাজনীতি ও ডেমোক্রাসিকে হাস্যোদ্দীপক বর্ণণার দ্বারা বিদ্রুপ করা হয়েছে। Rationalist লিখেছেন- অব্রাক্ষণের যে ছায়া মারায় না, সেই হল শ্যামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দার। পাল্টা জবাবে Nationlist

Dhaka University Institutional Repository

লিখলে-কলের কুলির রক্ত চুষে যে জোঁকের মত মোটা ও লাল হয়েছে, সেই হল রামের মত ডিমোক্রাটের সর্দার। বেচারা কলওয়ালা বেচারা আইন আচারিয়ার, দু'জনেই সমান গালখেতে লাগল"৩৪।

'সাহিত্য বনাম পলিটিক্স' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন পলিটিক্স হচ্ছে 'বেওয়ারিস মাল'। তাঁর মতে পলিটিক্স মানেই দলাদলি agitation এবং এর কারবার শুধু তেল-নুন-লাকড়ি নিয়ে, মহৎ কোন বিষয় নিয়ে নয়; তাছাড়া রাজনীতির সুনীতি, সুরুচি কোনটাই নেই। ১৯০৭ এর ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার হয়েছিল, তা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা- চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে বির্তক, মারামারি, এমনকি শেষ পর্যন্ত জুতো ছোঁড়াছুড়ি পর্যন্ত হয়েছিল। সুরাট কংগ্রেসের পাদুকা নিক্ষেপ-ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে 'নীল লোহিতের সৌরাষ্টলীলা গল্পে' অতি রঞ্জিত কল্পনার সাহায্যে লেখক কি অপূর্ব রোমান্সসৃষ্টি করে রাজনীতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। পলিটিক্সে মেতে থাকা সাহিত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। খুব ঠাট্টা করে তিনি বলেছেন-'পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে উঠবে ভাবমদমত্ত, দার্শনিকের হাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ঔপন্যাসিকের হাতে অদ্ভুত ও ঐতিহাসিকের কাছে ভূতগ্রস্থ (সাহিত্য বনাম পলিটিক্স)"।

খ) সমাজ ভাবনাঃ

সামাজিক প্রথার মূল উপড়ে ফেলা যে কত শক্ত, তা সংস্কারকর্মীরা তাদের সমাজ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। "সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে কোন জাতির সংস্কৃতি নানা রকমের সামাজিক প্রথার একটি বিশিষ্ট সন্নিবেশ বা প্যার্টান ছাড়া কিছু নয়"৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথা-মাত্রই বদ্ধমূল এবং মনের সুগভীর স্তর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত। অধিকাংশ প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে এই জন্য যে, সেই প্রথানুগত জনগোষ্ঠীর ধারণা প্রথা পালনের উপর তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত কল্যাণ নির্ভরশীল। তাই প্রথা জন সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা দুরূহ ব্যাপার। বহু বিবাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী ভদ্রভাবে কটাক্ষ বিদ্রুপ করেছেন। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- " পুরাতনের সঙ্গে নতুনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশ জনে করেছেন, যারা সমাজের মরচে ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্ঠা করেছেন-সেই তেল দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক। এর প্রমাণ রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখজন। এর প্রথম তিনজন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন সেটি খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এরা সকলেই সমাজদ্রোহী বলে গন্য। সমাজ সংস্কারকদের ন্যায় প্রমথ চৌধুরী সমাজের দেহে খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত স্নেহ প্রয়োগ করতে নারাজ বরং তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান থেকে নতুন প্রা ণ লাভ করে জনসাধারনের মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করতে চান। "তিনি সমাজ সংস্কারের ভূমিকা নেন নি। তার ছোট গল্পেও সেগুলোর প্রমাণ রয়েছে। সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধেই তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। "স্ত্রী স্বাধীনতা,বিধবা বিবাহ এই কথা শুনে তিনি(বড় বাবু) কানে হাত দিতেন। এ সব মত প্রচার যারা করে তারা যে সমাজের ঘোরশত্রু সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই"৩৬।

আমাদের "সমাজ নব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতি উভয়ই প্রমথ চৌধুরীর বড় অপছন্দ। কেননা সমাজ শুধু একজনকে আর পাঁচজনের মতো হতে বলে ভুলেও কখনো আর পাঁজজনের একজনের মতো হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের

Dhaka University Institutional Repository

স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র. তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে অপরের মতো হও, আর নিষেধ হচ্ছে নিজের মতো হয়ো না"৩৭।

আমাদের সমাজে যে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে প্রমথ চৌধুরী এই শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। তিনি 'বই পড়া' প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন-আজকের বাজারে বিদ্যা দাতার অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার কারণে তারা বাকি জীবন আরামে কাটাতে পারবে। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত ই অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণ সাপেক্ষে। অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহিতার কথাটা একেবারেই ভুলে যায়। এই সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষার স্বার্থকতা শিক্ষা দান করাই নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতেই সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জলন্ত করতে পারেন, তার বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শীষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তর সাধক মাত্র"৩৮।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানা শোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যপারটা পরিস্কার করা যাক।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব প্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্যই অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস এই বস্তু পেটে গেলেই উপকার হয়। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তা হলে সে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সে তখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাধা নাড়তে, হাত পা ছুড়তে শুরু করে। তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, ' আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, এই ঢোক আর এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে যা শুধু ছেলেদের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটি জোর করে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর ন্যায়। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইন্‌ফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন।

প্রমথ চৌধুরীর মতে পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়। তিনি সৃজনশীল শিক্ষায় বিশ্বাসী। মানসিক মুক্তির চিন্তায় তিনি ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'ইউরোপীয়রা মানসিক যৌবনের চর্চা করে আর ভারতীয়রা করে শারিরীক যৌবনের চর্চা'। কাজেই দৈহিক বৃদ্ধি নয়, মানসিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় আদলে জীবন গঠনের অনুকূলে লিখনি ধারণ করেছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষবাণী, উচ্চারণ করেছেন তার গল্পগুলিতেও।

Dhaka University Institutional Repository

'ট্র্যাজেডির সূত্রপাত' গল্পে তিনি বলেছেন- "এই স্কুল কলেজের পড়া বিদ্যা আমাদের ভিতরের আসল মানুষটি স্পর্শ করে না। মানুষের অনেক রকম প্রবৃত্তিকে শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জীবনের সাথে পরিচয় হবার পর কখন কোন প্রবৃত্তি জেগে উঠবে তা কে বলতে পারে? আর তখন সমস্ত মুখস্থ বিদ্যে এক মুহূর্তে ভেসে যায়। তখন মানুষ প্রকৃতির হাতে খেলনা মাত্র হয়ে উঠে"৩৯।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের সৃষ্টিশীল মনের অনুকূলে নয় বরং প্রতিকূলে। এই শিক্ষা আমাদের ভিতরের সৃষ্টিশীল মনকে স্পর্শ করে না। অপমৃত্যু ঘটায়। "নীল লোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল তার মৃত্যু হয়েছে- যা টিকে রয়েছে তা হচ্ছে সংসারে সার খানি ঘোরাবার একটা রক্ত মাংসের যন্ত্র মাত্র"৪০। নীল লোহিত কল্পলোকের সত্য ভাষ্যের অদ্বিতীয় কথকমাত্র। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'তার স্বধর্ম হারিয়ে যে জীবন তার আত্মজীবন নয়, অতএব তার পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন- সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নীল লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আমাদের লোক সমাজে যেটি অসত্য সেটি অন্তরলোকে অসত্য নাও হতে পারে। তাই নীল লোহিত যা বলতেন সে হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। এখন তিনি গল্প বলা ছেড়ে দিয়ে কেরানীর জীবন যাপন করছেন যেমন হাজার হাজার লোকে করে থাকে। লোকে বলে যে তিনি সত্যবাদী হয়েছেন; কিন্তু চৌধুরীর মহাশয়ের মতে নীল লোহিত মিথ্যার পক্ষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। কাজেই আমাদের সমাজের ধর্ম হচ্ছে স্বভাব ধর্মকে নষ্ট করা। এই সমাজ ব্যবস্থার মূলে প্রমথ বাবু কুঠার আঘাত হেনে বলেছেন-" আমাদের এ যুগ সত্য যুগও নয়, কালিযুগও নয়- শুধু তরজমার যুগ"৪১। বর্তমানকালে আমাদের নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি অর্থ্যাৎ আমরা আমাদের সৃষ্টিশীল মন থাকা সত্ত্বেও তাকে জাগ্রত

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারিনি ফলে আমরা একদিকে প্রাচীনভারত এবং আর এক দিকে নবীন ইউরোপ এই দুইয়ের মধ্যে দু টানায় পরে আছি। আমাদের এই আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করার মানসে অনুকরণবৃত্তি বর্জন করে নবসভ্যতার অনুবাদ করতে হবে। 'তরজমা' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। কোন ক্রমে লিখতে ও পড়তে শিখাকেই আমরা শিক্ষা বলে মনে করি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করি যে, যেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখকের মতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় বাহুল্যের ফলে প্রকৃত শিক্ষার কোন উনিশ-বিশ হবে না। কথাটা শ্রুতিকটু হলেও মূল্যহীন নয়, "যত দিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নব শিক্ষা মজ্জাগত না করতে পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার হবে তা ঠিক বোঝা যায় না"৪২। যতদিন পর্যন্ত " ইংরেজীর নিচে আমরা স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব ততদিন নিজেকে বা অপরকে কাউকে শিক্ষিত করতে পারব না। আমাদের সমাজ সমালোচনা করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয় যে সব কথা বলেছেন তা আজও অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষার সঙ্গে মনের টানের কথা স্বীকার করে বলেন "যে শিক্ষার মাঝে মনের টান নেই বোধ হয় ও জাতীয় শিক্ষার ভীতর কোন আনন্দ নেই। না মাস্টারের না ছাত্রদের"৪৩।

প্রমথ চৌধুরীর সমাজের প্রায় সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে মিলেছেন বিধায় তাঁর গল্প সাহিত্যে সকল সমাজের চিত্র বিচিত্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে। উকিল সমাজের কথা (পুঁজারবলী), চলচ্চিত্র সমাজের বর্ণনা (মেরি ক্রিসমাস), সুদখোর সমাজের চিত্র (পূঁজারবলী গল্প), বার্বনীতাদের জীবন চিত্র(প্রগতি রহস্য), সঙ্গীত শিল্পীদের জীবন সমাজ(বীনাবাই), তৎকালীন সমাজে ধনীদের ধন সম্পদ রক্ষার্থে নিস্পাপ শিশুকে নির্মম ভাবে হত্যা করে 'যখ' দেবার চিত্র 'আহুতি' প্রভৃতি গল্পে রয়েছে। প্রমথ

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরীর চিন্তা থেকে সাহিত্যিকদের জীবন প্রবাহ যে কত দৈন্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয় তার বর্ণনা বাদ পড়েনি। "কুমার বাহাদুর তার সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে এসেছিল। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম,'কেমন আছ?'

'ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। শরীর ভালো কিন্তু মন খারাপ। মন খারাপ কিসে হল। অর্থাভাবে। হ্যাঁ, তাই। এখন থেকে আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে-এই ভেবে মনটা মুষড়ে গিয়েছে ।

তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে?

ভয় নেই। তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসিনি। তুমি সাহিত্যিক দেবে কোথেকে"৪৪?

সাহিত্য মানুষের খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না। এটিই প্রমথ চৌধুরীর অভিমত। সাহিত্যিকদের এহেন অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণেই ভিক্ষে পর্যন্ত সাহিত্যিকগণ দিতে প্রায় অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'সাহিত্যের পথে' বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, প্রকাশ ১৩৪৩ বাং / প্রবন্ধ আধুনিক কাব্য- পৃং ১১৬-১১৭।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'সাহিত' বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ - কলিকাতা ১৩,১৪ বাং প্রবন্ধ 'সৌন্দর্যবোধ' পৃঃ৫১

৩. প্রমথ চৌধুরী গল্প সংগ্রহ বিশ্ব ভারতী গ্রন্থবিতান কলিকাতা ২০ শে ভাদ্র ১৩৪৮ 'অ্যাডভেঞ্চার জলে' পৃং৩৩৬।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য প্রবন্ধ সাহিত্যের সৌন্দর্য পৃং- ২৫৫।

৫. প্রমথ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, 'অবনীভূষনের সাধনা ও সিদ্ধি' পৃং৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

৬. (ক) প্রাগুক্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্য' প্রবন্ধ সৌন্দর্যবোধ পৃং ৫২

(খ) প্রমথ চৌধুরী "বীর বরের হারখাতা- টিকা ও টিপ্পনী।

৭. প্রাগুক্ত -গল্প সংগ্রহ-'রাম ও শ্যাম' পৃং১৭৬।

৮. প্রাগুক্ত-গল্প সংগ্রহ 'মন্ত্রশক্তি' পৃং৩৫৬

৯. প্রাগুক্ত-বীণাবাই পৃং ৩৫৬।

১০. জীবেন্দ্র সিংহ রায় 'প্রমথ চৌধুরী' মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১৯৫৪ পৃং ১০০

১১. প্রমথ চৌধুরী 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ-কলিকাতা-১৯৫২ প্রবন্ধ 'সাহিত্যে খেলা' পৃং ৯৬।

১২. গল্প সংগ্রহ,প্রাগুক্ত চার ইয়ারী কথা পৃং ২০

১৩. গল্প সংগ্রহ,প্রাগুক্ত চার ইয়ারী কথা পৃং ২৪

১৪. প্রাগুক্ত-চার ইয়ারী কথা পৃং ২৫

১৫. প্রাগুক্ত-আহুতি পৃং ১৭

১৬. প্রাগুক্ত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্ব সাহিত্য' পৃ ৭৩-৭৪।

১৭. প্রাগুক্ত-সাহিত্যের সামগ্রী পৃং ১৭

১৮. প্রাগুক্ত-গল্প সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী 'গল্প লেখা' পৃং ২৩০-২৩১।

১৯. প্রাগুক্ত- গল্প সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী 'ফরমায়েশি গল্প' পৃং১৪৭।

২০. প্রমথ চৌধুরী-'গল্প সংগ্রহ' গল্প 'বীনা বাই' পৃষ্ঠা নং ৩৯৮।

২১. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরী 'গল্প লেখা' পৃঃ ২৩৬।

২২. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরী 'সারদাদার সন্ন্যাস' পৃঃ ৪৫৬

২৩. প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ মাঘ ১৩২৪ বাং চিঠি অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা।

২৪. প্রাগুক্ত-'গল্প সংগ্রহ' প্রমথ চৌধুরী গল্প 'সারদাদাদার সত্য গল্প' পৃ ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

২৫. প্রাগুক্ত -প্রমথ চৌধুরী, 'অবনীভূষনের সাধনা সিদ্ধি' পৃ ৩২৬-৩১৭

২৬. বীরবলের আত্মপরিচয় 'শনিবারের চিঠি' অগ্রাহায়ণ ১৩৪৮ বাং

২৭. প্রাগুক্ত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'সাহিত্য'-'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' পৃং ১৭৬।

২৮. প্রাগুক্ত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'সাহিত্যের তাৎপর্য' পৃ ১১

২৯. প্রাগুক্ত- প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ,'সাহিত্য খেলা' পৃ ৯৭-৯৮

৩০. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ,'সবুজ প্রত্রের মুখ পাত্র' পৃ ৪১

৩১. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ,'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' পৃ ৬৯

৩২. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ,'ভাবনার কথা' পৃ ২৪৪

৩৩. প্রাগুক্ত- সবুজ পত্র প্রকাশ মাঘ ১৩২৪ বাং (অনুপকুমার বন্দোপাধ্যায় কে লেখা একটি চিঠি)

৩৪. প্রাগুক্ত প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ রাম ও শ্যাম পৃ ১৮৭

৩৫. বিনয় ঘোষ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ'

৩৬. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর 'বড়োবাবুর বড় দিন' পৃ ১০৭।

৩৭. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ 'সবুজপত্র' পৃ৪৮

৩৮. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ 'বইপড়া' পৃ১৫০

৩৯. প্রাগুক্ত- প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ 'ট্রাজেডী সুত্রপাত' পৃ৩৪৪

৪০. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ,'নীল লোহিত' পৃ ২০৯

৪১. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ,'তরজমা' পৃ ৩৫০

৪২. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ,'তরজমা' পৃ ৩৫৬

৪৩. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ,'অবনীভূষনের সাধনা ও সিদ্ধি' পৃ: ৩১৯-৩২০

৪৪. প্রাগুক্ত-প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহ,'স্বল্পগল্প' পৃ ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের গঠন প্রকৃতি ও শৈলী বিচার :

ইংরেজী উপন্যাসের প্রবর্তক ফীলডিং দম্ভভরে বলেছিলেন- "গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে সমালোচকের কোন শাসন চলবে না। এ রাজ্যে আমি যা বলব, তাই হবে"১। ফীলডিং এর দম্ভ যতটা অন্যায় শোনায় আসলে ততটা অন্যায় নয়। গল্প-উপন্যাস সত্যই কোন সাহিত্য অনুশাসন মেনে চলে না। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় না এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, যৌন সমস্যা, রাজনীতি, দেশপ্রেম, ব্যক্তিক রাগ-অনুরাগ,মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম, সব কিছুই এই রাজ্যের এক্তিয়ারে পড়ে। এর থেকে মনে হয় ফীলডিং-এর দম্ভ ও দাবি অনুচিত নয়।

"প্রমথ চৌধুরীর গল্পে গুরুগম্ভীর সনাতনী উপদেশ খুজঁতে গেলে আমরা ব্যর্থ হব, সামাজিক অপকার বা অন্যায়ের প্রতিকারের হদিশ সেখানে পাব না। খেলাচ্ছলে শিক্ষা বা গল্পচ্ছলে উপদেশ দানের মহৎ ব্রত প্রমথ চৌধুরীর ছিল না"২। সুতরাং নীতিবাগীশ বা ব্যবসায়ী পাঠক প্রমথ গল্প পড়বেন না, এটাই লেখক বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের এইটুকু ভূমিকা।

প্রমথ চৌধুরী একটি চিঠিতে স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'প্রচলিত মতগুলিকে আমল না দেওয়ার দিকেই তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি'। আর শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধি ছিল, মানুষের মন মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর জেগে উঠে বিরোধের স্পর্শে। সে কারণে আঘাত দিয়েও মানুষের মনকে অভ্যস্ত জীবনধারা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আবেশ থেকে জাগিয়ে তোলার তাঁর সাহিত্যচর্চার লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

"বহুদিন ধরে ব হুর কণ্ঠে যে কথা যে ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে আসছে, নিজের অনন্যতার বলে কোনো এক সুপ্রাচীন কালে যে কথা মানব মনের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, কালে কালে আবার সেই কথা, সেই ললিত ভঙ্গিই মানুষের মনকে ঘুম পাড়াতে থাকে"৩ / কারণ একদিন যে কথায় মনের জগৎ হঠাৎ আলোকিত হয়েছিল, সেদিকেই মানুষের ঝোঁক গিয়ে পড়ে। কিন্তু দিনে দিনে জীবনের মূলে আরো নতুন কথার দাবি যে জমতে থাকে মনের অনালোকিত আরো সব কুঠরিতে নতুন আলো জ্বালার আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জিত হয়ে চলে, সে দিকে খেয়াল থাকে না । তাই চিরপুরাতনের গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ ভেসে যায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর ঘটে না, পাঁচজনের একজন হয়ে পড়ে সে আর 'নিজের মত হতে পারে না' ।

আমাদের প্রেমানুভবের মূলেও সেই গড্ডালিকা প্রবাহ চলে আসছে কতদিন ধরে; তার হিসেব নেই; সজাগ ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র-স্পর্শহীন সে প্রেম কেবলি বিগলিত হয়ে রোমান্টিক হয়ে পড়ে। আমাদের প্রেমানুভবের মধ্যেও যুগ-যুগান্তরের এক আবিষ্ট মোহময়তা জড়িয়ে আছে, যার যথার্থ মূল্য কোনো কালে কেউ বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখেনি, সংস্কার দিয়ে মেনে নিয়েছেন। প্রেমের মূলে রোমান্টিক ভাবনার উৎসও এই গতানুগতিকতার মধ্যে। এই জন্য রোমান্স ও রোমান্টিক প্রণয়ের প্রতি প্রমথ চৌধুরী চির বিমুখ। কেবল এই কারণেই 'ফরমায়েসি গল্পে' ঘোষালের মুখে বাংলার প্রথম সার্থক কথা সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী'র প্রতিও কটাক্ষ করতে পেরেছেন তিনি ।

পার্থিব জগতে সচরাচর ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে যে সকল রচনা কর্ম তৈরী হয়েছে সেসকল নিত্য ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে প্রমথ বাবু গল্প রচনা করতে অপছন্দ করতেন। 'গল্প লেখায়' গল্পে তিনি জোড়ালো ভাবে বলেছেন "যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চাই না। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে

Dhaka University Institutional Repository

কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান"৪।

কল্প জগতের উদ্বুদ্ধভাবনা যখন বাস্তব জগতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে তখন আমরা তাকে সত্য বলে আখ্যা দেই; যে সকল চিন্তা অসামঞ্জস্যবিধান করে তখন-তা মিথ্যা বলে পরিগণিত হয়। প্রমথ বাবু গল্প সাহিত্যে বাস্তব জগতের সত্য-মিথ্যার ধার ধারতেন না। তিনি সদা কল্প লোকের সত্য কথাকেই গল্পে স্থান দিয়েছেন। 'নীল লোহিত' গল্পটি তাঁর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নীল লোহিত চরিত্রের মধ্যদিয়ে প্রমথ বাবু নিজের কথাকেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। নীল লোহিত মিথ্যা ভাষ্যের অদ্বিতীয় কথা মাত্র। তাঁর বিচরণ ভূমি কল্পনার সত্যলোকে-তার জগৎ আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে বহুদূরে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির পটভূমিকা পরিচিত জগতের নয়-পরিচিত জগতকে ছাড়িয়ে এক একটি অদ্ভূত ও অপরিচিত পৃথিবীর আস্বাদন এখানে পাওয়া যায়। তাঁর গল্পগুলি যেমন গল্পের সমভূমি নয়-পরিচিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যাও তাঁর বক্তব্য নয়। কোথাও বাংলাদেশের বাইরে সুরাটের পরিচিত গলিপথে এক মধ্যযুগীয় পরিবেশে অসাধারণ নারীর রহস্যময় চরিত্র, কোথাও রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি নিষ্ঠুর কাহিনীর রেখাবিন্যাস, কোথাও রেলগাড়ীতে মদ্যপ দেশীয় সাহেবের মুখে নীল ভেনাসের বিচিত্র উপাখ্যান, আবার কোথাও প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রীসিয়ান নাক ও ভায়োলেট চোখের 'স্বপ্ন' দেখা। আসলকথা প্লট ও পটভূমিকা-নির্বাচনে প্রমথ চৌধুরীর একটু নতুনত্বের প্রয়োজন। কিছু অসঙ্গতি কিছু আপাত বিরোধ, কিছু স্থান কাল ও ব্যক্তির বৈচিত্র ছাড়া যেন তাঁর পক্ষে গল্প লেখা সম্ভব নয়। তিনি চিন্তায় ও মননে প্রগতির পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁর গল্পের পটভূমিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের আস্বাদন

Dhaka University Institutional Repository

আছে। তাঁর চরিত্র গুলিতেও সাধারণ জগতের নয়। নারী চরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরও বেশী আছে। শুধু চরিত্র নয়, তাদের রূপও নতুন ধরনের-বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেন তারা বাঙ্গালী মেয়ে নয়। রূপবর্ণনাতেও তিনি প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করেননি-ভাস্কর্যের মত খোদাই করে তিনি এক একটি নারী মূর্তি রচনা করেছেন। নারী চরিত্রের চেয়ে নারীমূর্তি বলাই যেন অধিকতর সঙ্গত। 'প্রমথ চৌধুরীর নারী শুধু সুন্দরী নয়-তারা এক অদ্ভূত অপিচিত সৌন্দর্যের অধিকারী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়-১) 'চমৎকার দেখতে একেবারে নীল পাথরের ভেনাস। তাঁর গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতিরমালা, দু'কানে দুইটি বড় বড় প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কজায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি' (ভূতের গল্প)।

২। 'সেই গ্রীসিয়ান নাক্ সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট চাপা হাসি যার ভিতর আছে শুধু জাদু' (মেরী ক্রিসমাস্)।

৩। সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী; তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেত বসনা (বীনাবাই গল্প)।

৪। তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মত ছিল এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোন তোলা তাঁর চোখ দু'টি-দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিশ্চল ছিল।

লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়েনি সে চোখের ভিতরে যা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারিপার্শ্বের নরনারীর উপর অগাধ অবজ্ঞা (আহুতি গল্পে)।

৫। 'আমার মনে হল সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাঁর চোখের কোন থেকে ,তাঁর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল্। -এর সঙ্গে স্ত্রী লোকের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত, তাহলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম (ছোটগল্প)।

৬। 'যা দেখলুম তাতে মনে হল সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়, শ্বেত পাথরে খোদা দেবীমূর্তি; সকল অঙ্গ দেবতার মতই সুঠাম; দেবতার মতই নিশ্চল, আর তাঁর মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্বিকার' (একটি সাদা গল্প)।

শুধু নারী রূপ বর্ণনাতেই নয়, রচনার মূল প্রণালী দু'টি। বেশীর ভাগ লেখক যে পদ্ধতির অনুসরণ করেন, সেখানে লেখক যেন সর্বজ্ঞ। তিনি নিজে কোথাও উপস্থিত নেই, কিন্তু এক অদ্ভূত অদৃশ্য শক্তির বলে তিনি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর কাছে যে কোন চরিত্রই 'সে'। দ্বিতীয় আর একটি পদ্ধতি আছে, যেখানে পাত্র-পাত্রী সকলেই নিজেদের কথা বলে থাকেন। কখনও কখনও একজন বলে থাকেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই 'আমি'। সেই আমি গল্পাংশের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কান্বিত। এ দু'টি ছাড়াও আর একটি পদ্ধতি আছে। সেখানেও গল্প কথা 'আমি'-কিন্তু সেই 'আমি' গল্প কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়-এক নির্লিপ্ত কথক মাত্র। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে এই শেষোক্ত রীতির অনুসরণ করা হয়েছে-তাঁর গল্প কথা 'আমি' নৈব্যক্তিক বক্তা মাত্র। এই রীতির শ্রেষ্ঠ লেখক মোপাসাঁ। প্রমথ চৌধুরী সম্ভবত এই রীতির দীক্ষা নিয়েছেন এই ফরাসী শিল্পীর কাছ থেকে। তাই বলে "তিনি চেকভ বা মোপাসাঁ নন, এর জন্য ক্ষোভ করবার কিছু নেই, তিনি তাঁরই মত, এইটি সবচেয়ে বড় কথা"৫।

এডগার অ্যালেন পো-ই সর্বপ্রথম ছোটগল্পের কলা বিবিধ ও তত্ত্ব নিরুপণ করেন যা ১৮৪২ সালে 'গ্রাহামস্' এ প্রকাশিত হয়। ছোট গল্পের বিকল্প হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন Short Prose narrative' কথাটি। ছোটগল্পের সজ্ঞা প্রদানে তিনি Short

Dhaka University Institutional Repository

বলতে Requiring from half on hour to One or Two hours in perusal কে বুঝিয়েছেন। তিনি ছোট গল্পের আয়তন কৃশতার কথা উল্লেখ করে বলেন ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমূখীগতি।

পো-র তেতাল্লিশ বছর পরে ব্যান্ডের ম্যাথুজ তাঁর 'The Philosophy of the short story (১৮৮৫) গ্রন্থে খুব চমৎকার ভাবে ছোটগল্পের অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ছোটগল্প হল একটি Unity of Impression এই ধারণার সমগ্রতাই হল একটি ছোটগল্পের প্রাণ। ছোটগল্পে থাকবে একটি ধারণার সমগ্রতা ও একমুখিতা-প্লটের বুনোনির মতো ধারণার বিন্যাসও সেখানে লঘু অথচ গাঢ়বন্ধ হওয়ার প্রয়োজন। ম্যাথুজের Unity বা impression প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করা যায়। প্রমথ চৌধুরী একবার "অনুকথা"৬ নাম দিয়ে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ করেন। গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছিল চেকভের ছোটগল্পের কথা। তিনি বলেছেন- তোমার ছোটগল্প পড়ে চেকভের ছোটগল্পের কথা মনে পড়ল। এতে আলবোলা ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে"৭। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'ধোঁয়ার গন্ধ' হল সেই লঘু স্বচ্ছ Impression , কিন্তু সেই ধোঁয়া অজস্র রেখায় বিশ্লিষ্ট হলে চলবে না, এর ঘনত্ব চাই, চাই সামগ্রিক ঐক্য।

হেনরী জেমস্ আবার ছোট গল্পের অন্যদুটি দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। তিনি গল্পে "সংস্থান বিশ্লেষণ ও নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্রনের দিকেই গল্পলেখকের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে বলেছেন"৮। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কেউ কেউ ছোট গল্পের সংজ্ঞায়নে বলেছেন 'a slice of life' - এর কথা। আয়তনের দিক থেকে ও বহিরঅঙ্গবিচারের ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশকে কাহিনী রূপ দেয়া হয়, কিন্তু রস পরিনামের দিক থেকে এই কৃশকায় গদ্য কাহিনী জীবনের সমগ্র রূপকেই প্রকাশ করে।

সমারসেট মম ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন- ও saw the short story as a narrative of a single event, material or spiritual, to which by the climiation of everything that was not essential to its elucidation a dramatic unity could be given"9. [The Summing up (Mentor Book Edition) Pase-১৩০] ছোট গল্পের Dramatic Unity' বলতে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্জন করে একটি ঘটনাকে সেখানে একটি নাটকীয় ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়। নাটকীয় ঐক্যসূত্র বলতে সমারসেট মম ফর্মনিষ্ঠাকে বুঝেছেন।

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়েও হইল না শেষ,' -----এই 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' কাব্যাংশটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট গল্পের ইঙ্গিতমূলক পরিসমাপ্তির কথা বলেছে।

এই সকল সংজ্ঞালোকে আধুনিক ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্যকে নিম্ন লিখিত ভাবে রূপ দেয়া যায়। যথা:

ক) মহামুহূর্ত বা চরমক্ষণ (chiniax)
খ) ভাবের একমুখীনতা
গ) ইঙ্গিতধার্মিতা (Suggestivenss)
ঘ) দ্রুতপরিণতি
ঙ) ব্যক্তি জীবনদর্শন (Interpretation of life)
প্রভৃতি।

আইরিশ লেখক উইলিয়াম জেমস্ সর্বপ্রথম Stream of Consciousness' কথাটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Principles of Psycholog' (১৮৯০) তে প্রকাশ করেন। পরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা প্রবাহ রীতিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সর্বপ্রথম আনয়ন করেন। বিশেষ করে ছোটগল্প সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব, চেতনা প্রবাহরীতি, ব্যক্তিজীবন, প্রবাহমানতা প্রভৃতি আধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যলোকে বিচার করলে প্রমথ চৌধুরীর গল্প শুধু গল্পই থেকে যায়, ছোটগল্পের স্বরূপ বর্হিভূত রয়ে যায়।

'অ্যাডভেঞ্চার-স্থলে', 'অ্যাডভেঞ্চার-জলে', 'ভাবনার কথা'- এই তিনটি গল্পের কোনটিই গল্প হয়ে ওঠেনি। 'ভাবনার কথা' গল্পটি বিচিত্র বাকচাতুর্য ও তর্কজালের সমষ্টি মাত্র- প্রবন্ধধর্মী ও সংলাপসর্বস্ব। দু'টি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কোথায় যে অ্যাডভেঞ্চার তা উপলব্ধি করা দুরূহ। অবশ্য সরস ব্যক্তব্য মাঝে মাঝে উপভোগ্য হয়েছে। গল্প না থাকার জন্য কাহিনীর শেষে লেখাকে মর‍্যাল টানতে হয়েছে। তিনি কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে একটি মূল্যবান আত্মবিশ্লেষণ করেছেন- "সব কটিকে গল্প বলা যায় কি-না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে এ গুলিকে গল্প বলছি এই জন্য যে, এ যুগে গল্প সাহিত্যের কোনো ধরাবাঁধা বিষয়ও নেই, রূপও নেই। এ কালে প্রবন্ধ হোক ভ্রমণবৃত্তান্ত হোক; যে লেখার ভিতর মানুষের মনের কিংবা চরিত্রের কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়, তাই গল্প বলে গ্রাহ্য হয়"১০। নিজের গল্প সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। 'যখ', 'ঝোট্রেন ও লোট্রেন', 'স্বল্প-গল্প', 'প্রগতি রহস্য' প্রভৃতি ঠিক গল্প বলা সঙ্গত নয়। গল্পের একটি আভাস আছে মাত্র। কিন্তু কাহিনীর কোন সুস্পস্ট বিন্যাস নেই। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শ্রেণীর গল্পকে 'অনুকথা'১১বলেছেন।

গল্পলেখক প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি-নীতিতে অগ্রাহ্য করেছেন। ছোটগল্পের নাটকীয়তা এখানে আছে। কিন্তু তার কাহিনী অংশের দ্রুত সঞ্চারী প্রবাহমানতা পদে পদে বাঁধা পেয়েছে। মূলগল্পের চেয়ে তার সুদীর্ঘ ভূমিকার দিকেই যেন গল্পকারের প্রধান আকর্ষণ। ভূমিকার বির্তকবহুল

Dhaka University Institutional Repository

উপলখন্ড পার হয়ে সূত্র শরীরী গল্পাংশটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সেই ক্ষীণকায় গল্পের মধ্যেও একটি বাঁধাহীন স্বচ্ছন্দ প্রবাহ নেই। গল্পের মাঝে মাঝে নানা তর্ক-বির্তক ও বিচিত্র প্রসঙ্গ এসে তার গতিরস খন্ডিত করে দিয়েছে। গল্পকার যেন তাঁর গল্পরসের প্রতি নির্মম, অনেক নিটোল গল্পাংশও আকস্মিক বিচার-বিতর্কের মন্তব্য তীক্ষ্ণ অসিফলকের আঘাতে টুকরো হয়ে টুকরো হয়ে ঝড়ে পড়েছে। তাই প্রচলিত ছোটগল্পের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে, প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে তা অনুপস্থিত। এই কারনেই তাঁর গল্পগুলি মিশ্রধর্মী গল্পরসের সঙ্গে বিচার-বিতর্ক ও সমালোচনাত্মক অংশগুলির অবাধ মিশ্রণ তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রমথ চৌধুরী কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলে গল্পকারের একটি আপাত বিরোধী বিচিত্র ভূমিকা চোখে পড়ে- সে এক দ্বৈত ব্যক্তিত্বের রহস্য। একদিকে অপূর্ব কথারসিকতা, গল্প জমিয়ে তোলার আশ্চর্য গুণ,-কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচকের সদাজাগ্রত বিচার বুদ্ধিও আছে-এ্ দ্বিতীয় সত্তাটি অত্যন্ত চতুর সুযোগ সন্ধানী সামান্যতম সুযোগটুকু নিয়ে সে তাঁর তর্কজাল বিস্তার করে চলে।

প্রমথ চৌধুরীর "ছোটগল্পগুলি প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের এক বিচিত্র বর্ণ সংকর"১২। তাঁর ছোটগল্পের পাঠকের পক্ষে তাঁর প্রবন্ধের কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক তার কারণ প্রবন্ধধর্মী সমালোচনাত্মক অংশের অনেকখানি ছোটগল্পের এলাকাভুক্ত। গল্প ও প্রবন্ধের প্রচলিত ব্যবধান ভেঙ্গে গল্প থেকে প্রবন্ধের সীমায় বিচরণ করা অথবা প্রবন্ধ থেকে গল্পের সীমায় ফিরে আসা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। গল্পের মধ্যে আর্ট, জীবন, সমাজ, তৎকালীন রাজনীতি, নরনারীর সম্পর্ক প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি যে সমস্ত সরস মন্তব্য করেছেন, তাঁর মূল্য কম নয়। অনেক সময় তিনি তাঁর নিজের রচনারই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে বসেছেন। 'ঘোষালের হেয়ালী' গল্পের

Dhaka University Institutional Repository

সখীরাণীর মুখ দিয়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথাই যেন সরসভাবে বলেছেন, তার দু'আনা গল্প, আর পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা তর্ক অর্থাৎ বাক্যি। 'গল্পলেখা' গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে সুকৌশলে চৌধুরী মহাশয় তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

এই ঘন্টাখানেক ধরে বকর বকর করে আমাকে একটা গল্প লিখে দিলে না।
-----আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও সেইটেই হবে- -----গল্প না প্রবন্ধ ? -----একাধারে ও দুই-ই।

এই সামান্য কথোপকথন অংশে যেমন গল্প-প্রবন্ধের অর্ধনারীশ্বর বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে, তেমনি প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি যে প্রধানত সংলাপ-নির্ভর তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষাত্মক সংলাপই প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির প্রাণ। কাহিনী-বিন্যাসের দিকে ও গল্প রসের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল কম, বিবৃতির মাধ্যমে কথার জাল বয়ন করার দিকেও তাঁর আগ্রহ খুব বেশী ছিল না- তাই অনিবার্যভাবেই তাঁর গল্পগুলি সংলাপ-বাহন হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রায় সব গল্পেই তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে হয় দ্রষ্টা না হয় ব্যাখ্যাতার স্থান অধিকার করেছেন, কখনও কখনও নিজে মুখেও গল্প বলেছেন-তাই তাঁর গল্পগুলিতে উত্তমপুরুষ এক বচনের ব্যবহার লক্ষণীয়।
প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির বিষয়বস্তু অসাধারণ। বিষয়বস্তুতে পুরাতন পৃথিবীর গন্ধ,কিন্তু রচনারীতিতে আধুনিকতার আস্বাদন-প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি এই বিপরীতের আন্দোলনে বিস্ময়কর। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, Though Provekingly modern in his essays, his stories are of old-world romance of dangerous living and abounding animal spirits"১৩.

Dhaka University Institutional Repository

কথা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর জগৎ শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। শরৎচন্দ্রের গল্পের কাহিনী অতিপরিচিত বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্তের সমাজ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বিগত যুগের ক্ষীণ রেশটুকু যেন মিলিয়ে যায়নি, অষ্টাদশ শতকীয় রাজসভার বৈদগ্ধ্য স্মৃতি-ধূপের মতো এখনো ঘুরে বেড়ায়। চরিত্রগুলিও এক একটি টাইপ-কোথায়ও গল্প পিপাসু জমিদার, কোথায়ও মধুর-মিথ্যাভাষী-বিদূষক, কোথায়ও অদ্ভুত চরিত্রের মাতাল সাহেব, কোথায়ও বা প্রনয়রসিক প্রেতাত্মা, আমাদের কোথায়ও বা অমানুষিক সৌন্দর্যময়ী পাথরের খোদাই করা এক একটি অসাধারণ নারী মূর্তি। প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রগুলি যেন বিচিত্রবর্ণের শোভাযাত্রা। তাঁর গল্পগুলি জীবনের রহস্যের নিগূঢ় সত্যকে উদ্ভাসিত করে না, শুধু বিস্ময়ের একটি আঘাতে সচকিত করে তোলে । কিন্তু কী অপূর্ব ফর্ম নিষ্ঠা! যেন ঘন-সংহত স্ফটিকবিন্দুর ওপরে একটি পরিচ্ছন্ন মানস- আকাশের উজ্জ্বল প্রতিফলন।

আমরা জানি গল্প রচনার দুইটি ষ্টাইল আছে। এক, পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী রচনা-দুই, খেয়াল অনুসারে রচনা। প্রথম ক্ষেত্রে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্রকাহিনী আগে ভেবে নিয়ে তারপর গল্প লিখতে বসতে হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাহিনী আগে থেকে ভেবে নিয়ে গল্পকে আপন খেয়ালে চলতে দিতে হয়। প্রথম রীতিতে গল্পের ঘটনা ও কাহিনীর রূপরেখা স্থির থাকে বলে অবান্তর প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া যায়। দ্বিতীয় রীতিতে কাহিনী ও ঘটনার ছক্ আগে থেকে ঠিক থাকে না বলে গল্প সেখানে এগোয় পাত্র-পাত্রিদের তর্ক-বিতর্কে ধাক্কা খেতে খেতে, নানা বিচিত্র খাতে বাঁক নিতে নিতে- তাঁরপর সেই খেয়ালী চলন সমাপ্ত হয় একটা পরিণতির আবর্তে। গল্পের এই অভিযাত্রায় স্বাধীনতা থাকে; অতর্কিত পরিবর্তন থাকে, থাকে আপন ইচ্ছায়

Dhaka University Institutional Repository

চলার স্বাচ্ছন্দ্য-আর তারই আশে পাশে জমে ওঠে কত অবান্তর কথা; অনাবশ্যক বিষয়। অনেকে যেমন পথে চলতে চলতে এদিক সেদিক তাকায়, থমকে দাঁড়ায়, ঝগড়া বাঁধায়-যেন সময়ের তাগিদ নেই, তেমনি চলে এই ধরনের গল্প .....শেষ পর্যন্ত যদি ঘাটের বদলে অঘাটায় পৌছাঁয় তবু যেন কুচ পরোয়া নেই। প্রমথ চৌধুরীর এই দ্বিতীয় রীতিতে অনেক গল্প লিখেছেন- গল্পের মুক্ত স্বচ্ছন্দ বিস্তার আছে 'ফরমায়েসি গল্পে', 'নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলায়', 'নীল লোহিতের স্বয়ম্বরে', 'ঘোষালের হেয়ালীতে'। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে এই সব ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য এবং এই বুদ্ধি প্রমথ চৌধুরীর ছিলো বলেই তিনি এই ধরনের গল্প লিখতে বেশী ভালবাসতেন। নির্বাচন শক্তির, ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার সমাবেশ ও অসাধারণ ঘটনার সৃষ্টি অসম্ভব। পাকা ওস্তাদ রাগভ্রষ্টের আশঙ্কা জাগিয়ে রাগরূপ কেবল বজায় রাখেনা, ফুটিয়ে তোলেন। আর্টিষ্ট আত্মাসমাহিত বলেই ক্ষণিক বিচ্যুতি তাঁর হস্তামলোকবৎ। সুতরাং এই ধরনের গল্পে কেন অবান্তর প্রসঙ্গ আছে এবং সেগুলি রচনায় চৌধুরীর কৃতিত্ব কতখানি তা জানা গেল। তবে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী লিখিত গল্পেও অবান্তর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত নয় যেমন 'আহুতি', 'ফাষ্টক্লাস ভূত', 'বড় বাবুর বড় দিন', 'একটি সাদা গল্প', 'সহযাত্রী', 'পূজার বলী', 'মন্ত্র শক্তি', 'মেরী ক্রিসমাস', 'চার ইয়ারী কথা'।

গল্পের অর্থ যদি হয় 'সুনির্বাচিত ঘটনাশ্রিত জীবন চিত্র' তবে প্রমথ চৌধুরীর সব গল্প তা নয়; আর গল্প বলতে যদি 'আলাপ-আলোচনাগত খন্ড জীবনভাষ্যও' বোঝায়- তবে প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র কথা সাহিত্যকেই গল্প বলা যায়। বস্তুত; গল্পের সুনির্দিষ্ট সজ্ঞা দেওয়া কঠিন-কারণ মোপাসাঁর রচনাকে যেমন গল্প বলা যেত তেমনি এইচ.জি. ওয়েলসের রচনাকেও গল্প বলা হয়; অথচ দুয়ের আকৃতি-প্রকৃতি এক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এবারে আসা যাক প্রমথ চৌধুরীর গল্প গুলির বৈশিষ্ট্য বিচারে। আমরা প্রমথ চৌধুরীর গল্প পাঠে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি দেখতে পাই।

১। করুণরসের বিরোধী এবং হাস্যরসের অনুকূলবর্তী
২। রোমান্স বিমুখতা
৩। সংলাপধর্মীতা
৪। মিশ্রধর্মীতা
৫। বিচার-বিতর্ক সংকুলতা
৬। দ্বৈতব্যক্তিত্বের রহস্য
৭। প্রবন্ধ ও ছোট গল্পের বিচিত্র বর্ণ সংকর
৮। লঘু-চপল ব্যঙ্গের সুর প্রভৃতি।

'ট্রাজেডীর সূত্রপাত' গল্পটিতে একজন পৌঢ় অধ্যাপকের অতীত জীবনের স্বীকৃতির মাধ্যমে একটি উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেশের বর্ণনা আছে। তথাকথিত শিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণের বাঁধ ভেঙ্গে কিরূপে প্রবৃত্তির বেগ উদ্ভাস হয়ে ওঠে অধ্যাপক তাঁর নিজের জীবন দিয়ে সেই গুরুসত্য উপলব্ধি করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রেমের কবিতা এই প্রণয়োন্মেষটিকে মোহমোদির করে তুলেছিল। কিন্তু লেখক এর ছবিকে দীর্ঘ করেননি, বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাত দিয়ে তাঁর আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। প্রেমের যে স্বপ্ন তরুণ ফুলের মতো সরস সতেজ ও বর্ণবাদির হয়ে উঠেছিল, তাকে তীক্ষ্ণ পরিহাসের নির্মম আঘাতে ধুলিশায়ী করেছেন। এইরূপে ট্রাজেডীর সম্ভাবনাটুকুকেও বিদ্রূপের রসে ভরে তোলা হয়েছে। 'সহযাত্রী' গল্পটিকে সহজেই ট্রাজেডীতে পরিণত করা চলত-কারণ গল্পটির মধ্যে একটি ট্রাজেডীর চমৎকার সম্ভাবনা ছিল। সিতা কণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের বিবাহ জীবনের ব্যর্থতা, তৃতীয় পক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর অপরের সঙ্গে পলায়ন ও তাঁর সন্ধানে গেরুয়া বন্ধুক হাতে করে গাড়ীতে গাড়ীতে ঘুরে বেড়ানো-সবকিছুর মধ্যেই ট্রাজেডীর বীজ ছিল, কিন্তু নায়ক চরিত্রের বেশভূষণ, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের আড়ালে তা ঢাকা পড়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে অবিমিশ্র ট্রাজেডীর কোন স্থান নেই।

পশুর প্রতি মানুষের ভালবাসা বাংলা সাহিত্যে নতুন কোন ঘটনা নহে। মাহবুবুল আলম এর 'কোরবানী', শরৎচন্দ্রের 'মহেষ', আবুল মনসুর আহমদের 'হুজুর কেবলা' প্রভৃতি পশুপ্রতি মূলক ছোটগল্প। প্রমথ চৌধুরী মানব-পশু প্রেমকে আলাদাভাবে অভিনব কায়দায় 'ঝাপান খেলা' গল্পে ধারণ করেছেন। গল্পটিতে ট্রাজেডীর বীজ নিহিত আছে সত্য কিন্তু সেই করুণসুরটিকে লেখক হাসির মাধ্যমে এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যে সেটি আর অশ্রু না ঝরিয়ে নয়নাশ্রুকে দমিত করেছে। তারপর গল্প কথক বলেছেন, আমিও কি একদিন 'বাবা, হাম চলতা, কুচ্ ডর নেই' এই শেষ কথাটি বলে যেতে পারব। বিষাক্ত সর্পের ছোবলে বীরবলের মৃত্যুটি নিসন্দেহে করুণ রসের খোরাক কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বীরবলের জীবন-পরিনাম উপলক্ষ্য করে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার রূপটি যেন নিরাবরণ ভাবে ফুটে তুলেছে- যেখানে করুণ রসকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'ঝোট্রন ও লোট্রন' গল্পটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রমথ বাবু করুণ রসের বিরোধী ছিলেন। অস্থি চর্মসার শুন্য 'ঝোটন ও লোটন' আস্তাবলে আবদ্ধ। রোগে ও পথ্যাভাবে ঝোট্রনের মৃত্যুটিও করুণরসের আবীর বটে-এখানেই গল্পকাহিনীটি শেষ হতে পারত কিন্তু লেখক সে কাহিনীটিকে বিলম্বিত করে আবেগঘন মুহূর্তটিকে লঘু করে এক হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। লোট্রনের মৃত্যুর পরে তার বিষয় সম্পদ নিয়ে ঝোট্রন ও চিনিবাসের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে সেটি লেট্রনের মৃত্যু স্মৃতিকে লাঘব করে দেয়। এটিই প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য। তিনি যে কোন বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে পারতেন। ভাষা ও শব্দ নিয়ে তিনি অনায়াসে খেলা করতে পারতেন এখানেই তার অভিনবত্ব। তিনি গল্পের প্লটকে আলোচনা আর যুক্তিবিতর্কের জাঁতা কলে ফেলে নিছক ছোটগল্পের রসকে জমাট হতে দেননি, অথচ গল্পাংশ ও তর্কাংশ মিলিয়ে একটি আশ্চর্য গাল গল্পের পরিবেশ গড়ে তুলেছেন,-এটুকুই প্রমথ চৌধুরীর গল্প লেখার সাধারণ টেকনিক। এতে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, আর বাংলা সাহিত্যও পেয়েছে একটি বিশেষ স্বাদুতার স্পর্শ। প্রথমত জীবন-মূলক গল্পে জীবনের সহজ ইমোশনকে জমাট হতে না দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে প্রতি পদে পদে; এই বুদ্ধির খেলায় চৌধুরী মহাশয়ের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য মিলেছে তার অভিজাত মনের অনন্যতা। (দ্র. রবীন্দ্রনাথ 'প্রথম গল্প সংগ্রহে'র 'ভূমিকা')। ফলে তাঁর মনীষাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ঘটেছে অ-সাধারণ স্বতন্ত্র প্রকাশ। আর এক দিকে নিজ ব্যক্তি জীবনের মতো নিজের গল্পের আবেদনকেও আবেশ লঘু হয়ে পড়তে দিতে শিল্পীর ঘোর আপত্তি ছিল; তাই গভীরতম অনুভবকেও বেদনাঘন হতে দিতে তিনি নারাজ। শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন; "ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই-অথচ কত বড় না একটা ট্রাজেডী পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইন্ড বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে"। 'আহুতি', 'ট্রাজেডীর সূত্রপাত', 'একটি সাদা গল্প' প্রভৃতি গল্প বিশ্লেষণ করলে শরৎ চন্দ্রের উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে। নিঃসংশয় ট্রাজেডীর সুর ধ্বনিত হয়েছে 'একটি সাদা গল্পের' অন্তে। শ্যামলালের অপূর্ব সুন্দরী শিক্ষিতা কিশোরী কন্যার বিয়ে হল ক্ষেত্রপতির সঙ্গে। যে ক্ষেত্রপতি তাঁর বিগত স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেই আগত স্ত্রীকে ঘরে আনবেন ঠিক করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন বয়সে শ্রীমতির

Dhaka University Institutional Repository

বাবার সমান। ক্ষেত্রপতি এ বিবাহ করার একমাত্র কারণ, শ্রীমতি সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করার লোভ ক্ষেত্রপতি কখনো সংবরণ করতে পারেননি; এ ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতিকে আত্মসাৎ করবার উপায়ান্তর নেই জেনে তিনি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হলেন।

বিবাহ বাসরে অপরূপ সুন্দরী শ্রীমতিকে দেখে সদানন্দের মনে হয়েছিল,--"সুন্দরী স্ত্রী লোক নয়, শ্বেত পাথরে খোদা দেবীমূর্তি, তাঁর সকল অঙ্গ দেবতার মতোই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল আর তাঁর মুখ দেবতার মতোই প্রশান্ত আর নির্বিকার। বর কনে মানিয়েছিল ভাল, কেননা ক্ষেত্রপতিও যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুপুরুষ; তাঁর বয়েস পয়ঁতাল্লিশের উপর হলেও ত্রিশের বেশী দেখাত না, আর তাঁর মুখ ছিল পাষাণের মতোই নিটোল ও কঠিন"। দেখে সদানন্দের মনে হয়েছিল, যেন দু'টি Statue-র বিয়ের অভিনয় দেখছে। হঠাৎ তার অন্যমনস্ক কানে এলে, ক্ষেত্রপতিও বলছেন "যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব"। গল্প কথক সদানন্দ বলেছে,-এ শোনা মাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকারের জীবনের, তবে তা Comedy কি Tragedy তা বুঝতে পারলুম না"। গল্পরস সম্বন্ধে শিল্পীর সংকেত এখানে অর্থবহ, Comedy-Tragedy-র বিতর্কের অতীত অনির্বচনীয় জীবন রসে তপ্ত ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনায় ভরপুর হয়ে আছে। কিন্তু সচেতন ভাবেই শিল্পী এখানে একটি অখন্ড ছোটগল্পকে বিন্দু-কেন্দ্রিত হতে দেননি, বরং গল্পের Theme কে বিকেন্দ্রিত করে দিয়েছিলেন একাধিক ছোটগল্পোচিত প্লট-এর বিস্তৃর্ণতায়। শ্যামলাল আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে আর একটি সুন্দর ছোটগল্পের প্লট গড়ে তোলা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাজেডী সূত্রপাত' গল্পে প্রণয় ধর্মের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিকে শিল্পী স্বীকার করে নিয়েছেন। বিপত্নীক প্রৌঢ় অধ্যাপকের জীবনে কন্যা সমতুল্য ছাত্রীর আসক্তির দুর্বলতাটি ট্র্যাজেডীর আকড় হতে পারত; কিন্তু প্রমথ বাবু সে দিকে অগ্রসর না হয়ে বরং তরুণের দৃষ্টান্ত টেনে এ ধরনের প্রণয়কে ব্যঙ্গ করেছেন এই বলে-"যদি কখনো সে অবস্থানে প্রেমে পড়ে তা হলে তুমিও Seriously ill হয়ে পোড়ো তা হলেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে"। প্রমথ বাবু কখনো করুণরসকে ভয়ানক রসে আবার কখনো বা হাস্যরসে পরিণত করেছেন- "করুণরসে আঁখিকে সিক্ত হবার বাসনা তা আদও নেই বললে অত্যুক্তি হবে না বলেই আমার ধারণা"।

'আহুতি' গল্পে এক নিষ্পাপ শিশুকে বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু গল্প কথক সেই করুণ দৃশ্যটিকে বর্ণনার গুণে ভয়ানক রসের মাধ্যমে গল্পের পরিসমাপ্তী ঘটিয়েছেন। পুত্রহারা রত্নময়ীর দুঃখে আমরা বেদনার্ত হই, কিন্তু শোক প্রকাশের অবকাশ দেননি প্রমথ বাবু; এখানেই তার বিশেষত্ব।

প্রমথ চৌধুরীর কতকগুলি গল্পের মূলরস স্যাটায়ার, প্যারাডক্স, বিদ্রূপাত্বক আলোচনা ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকাই এই জাতীয় গল্পের উদ্দেশ্য। এখানে ছোটগল্পের সমগ্রতা অনেক স্থলেই খর্ব করা হয়েছে। 'রাম ও শ্যাম' গল্পটিতে বিদ্রূপাত্বক অতি চিত্রণ উচ্চগ্রামে উঠেছে। রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশ প্রেমিকতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। গল্পটির শেষাংশে যে মন্তব্য আছে, তাতে লেখকের ব্যঙ্গাত্বক মনোভাবের সুস্পষ্ট কারণ জানা যায়, এ গল্প এ দেশে কবে যে শুরু হয়েছে তা কারও স্মরণ নেই, আর কখন যে শেষ হবে তারও কোনো আশা নেই। 'এ গল্প কখনো যদি শেষ হত তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে

Dhaka University Institutional Repository

বড় ট্র্যাজেডী হত না'। -গল্পটি আসলে রূপক, সমসাময়িক, রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনাই যেন এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। বাক্-চাতুর্য, শেষের সুচতুর শরক্ষেপ ও তীক্ষ্ণচূড়-এপিগ্রামের অজস্র প্রয়োগ লেখকের মূল উদ্দেশ্যকে মাঝে মাঝে পথভ্রান্ত করেছে।

'বড় বাবুর বড় দিন' গল্পটিতে পত্নীগত প্রাণ বড়বাবুর আতিশয্য ধর্মী আচরণকে এক বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে স্থাপন করে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সৃষ্টি করা হয়েছে। বড় বাবুর পত্নী প্রেমের আতিশয্য ও প্লট রচনার কৌশল-ই লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির ভিত্তিভূমি। এখনকার অসঙ্গতির মূল কারণ দু'টি-বড় বাবুর চরিত্র ও বিচিত্র সংস্থান সৃষ্টি।

'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পটিতে লেখক প্যারাডক্সকেই সমগ্র কাহিনীকে কেন্দ্রমূলে স্থাপন করেছেন। অবনীভূষণের সমাজ-হিতৈষণাই ক্রমাগত সৌন্দর্য-সম্ভোগের পথ বেয়ে বণিতা-বিলাসে পরিণত হল, বণিতা-বিলাসের রোগমুক্তি ঘটলে আধ্যত্মিক সাধনার সূত্রপাত হল। জীবনের এই পরিবর্তনশীলতা ও বিচিত্রমুখী চলচিত্রতার সঙ্গে তাঁর বন্ধু প্যারীলালের আপাত বিরোধী চরিত্রটির সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্যারীলাল যতই জীবন্ত প্যারাডক্স হোক না কেন, অবনীভূষণের নিগূঢ় পরিবর্তন গুলির জন্য তার দায়িত্ব খুব বেশী নেই-এই দিক থেকে গল্পটি দোষ মুক্ত নয়। তীক্ষ্ণাগ্র সরস মন্তব্য ও প্যারাডক্সরে চতুর প্রকাশই গল্পটির প্রাণকেন্দ্র। 'ভাবনার কথা' গল্পটি বিচিত্র বাক্ চাতুর্য ও তর্কজালের সমষ্টিমাত্র-প্রবন্ধধর্মী ও সংলাপ সর্ব স্ব।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে দুটি চরিত্র সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই দু'টি চরিত্র, নীললোহিত ও ঘোষাল। নীল লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে মিথ্যা কথার আর্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। অতিরঞ্জিত মিথ্যাভাষণের অদ্বিতীয় শিল্পী নীল লোহিত। লেখকের মতে নীল লোহিতের মত আদর্শ কথক আর

Dhaka University Institutional Repository

নেই, এ বর্ণনার ওস্তাদী ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোটখাট জিনিস ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অনাবশ্যক নয়। 'নীল লোহিত' গল্পটি এ পর্যায়ের গল্পগুলির প্রথম, শুধু তাই নয় পরবর্তী গল্পগুলির ভূমিকাও বটে। 'নীল লোহিতের প্রকৃত গত বৈশিষ্ট্য, তার গল্প বলার প্রারম্ভিক ইতিহাস ও গল্প বলা ছেড়ে দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দু'টি কাহিনীই সমানভাবে কৌতুক কর। নীল লোহিতের গল্পগুলি শুনবার জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিস নয়। নীল লোহিতের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা ছিল এই যে সম্ভব-অসম্ভব নানাজাতীয় বিষয়কে একই সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অদ্ভুত রস সৃষ্টি করতে পারতেন- কথা শুধু তিনি মুখ দিয়েই বলতেন না, - হাত, পা, চোখ যেন এক সঙ্গে কথা বলত। তাই নীল লোহিতরে অজস্র মিথ্যাভাষণও সত্য হয়ে উঠত। তিনি অপ্রত্যক্ষ, অবাস্তব ঘটনাকে চিত্রময় করে তুলতে পারতেন। নীল লোহিতের কল্পনাশক্তি ছিল যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনি সুপ্রচুর, 'তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়।

'নীল লোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পটিতে অসম্বব অতিরঞ্জন-চিত্রণ চরমে উঠেছে। রাজা ঋষভরঞ্জনের একমাত্র সন্তান মালশ্রীর স্বয়ম্বর-সভা-বর্ণনায় নীল লোহিতের গল্প কথকের ভূমিকাটি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের স্বয়ম্বর সভার যে ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি এই গল্পটিতে নিপুণ কলা-কৌশলের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে তার তুলনা নেই। নীল লোহিত আদর্শ কথক্, তাই তার মুখে হাসি নেই, কিন্তু শ্রোতা মন্ডলী সশব্দ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। গল্পটি যথার্থই একটি 'Roaring farce'.'নীল লোহিতের আদি প্রেম' গল্পটি একটি নির্দোষ কৌতুক রসের কাহিনী ।

Dhaka University Institutional Repository

নীল-লোহিত নাকি পাঁচ বছর বয়সে প্রেমে পড়েছিলেন। এবং প্রেম কাহিনীর ওপরে ব্যঙ্গাত্মক রোমান্স চাপিয়ে রীতিমত একটি প্রেমের গল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু নীল লোহিতের এই গল্পটির একটি বাস্তব সূত্রছিল।

নীল লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা' গল্পটি শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটি প্রমথ চৌধুরীর ফর্ম নিষ্ঠার ও সংযত শিল্প সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গল্পটির কেন্দ্র সংযত ঐক্য সুমসৃণ মুক্তার মত সুডৌল। কথাগ্রন্থনে কোন শিথিলতা নেই, কোন ফাঁক নেই,-এমনকি সুমার্জিত কথাসূত্রের মধ্যে কোনটি অযথা স্থূলো নয়। গল্পটির শেষে যে আকস্মিকতার চমক সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এর প্রাণ। নীল লোহিত মিথ্যা ভাষণের ও অতিরঞ্জনের বাদশা-কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর তাঁর ওষ্ঠাগ্রে। তাঁর বলার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে শ্রোতারা পর্যন্ত ক্ষণকালের জন্য সত্য-মিথ্যার ভেদটুকু ভুলে গিয়ে তৃষিতের মতো তাঁর অসাধারণ কাহিনীর রস পান করে। আপাত বিরোধী কৌতুককর পরিবেশের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য স্থাপনের মূলে আছে আত্মপ্রত্যয়বান কথকের প্রতিভা। 'নীল লোহিতের আদি প্রেম' গল্পটি তেমন রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি- এখানে বক্তা তাঁর উদ্ভট কাহিনীর ফাঁক গুলিকে যথারীতি ভরাট করে তুলতে পারেননি।

নীল লোহিতের পরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে ঘোষাল। নীল লোহিত যেমন অসম্ভব ব্যাপারকেও স্বাভাবিকের মত রূপ দিতে পারতেন; ঘোষালের তেমনি কতকগুলি অসাধারণ গুণছিল-উপস্থিত বুদ্ধি ও বাক্ চাতুর্যে তাঁর দক্ষতা কম নয়।

বিতর্কের মধ্যে তিনি কখনোও বেসামাল হয়ে পড়েন নি- ঘোরতর বাগযুদ্ধের মধ্যেও তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা লুপ্ত হয়নি। ঘোষাল-চরিত্রটি পরিকল্পনার মধ্যে মধ্যযুগীয় দরবারী পরিবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। কথা বেছে খাওয়াই তাঁর পেশা। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

মকদমপুরের রায় মশায়ের সান্ধ্য-মজলিশের বেতন ভোগী কথক। বিজ্ঞান বিবর্জিত রায় মহাশয়ের মত অবসরপুষ্ট অপদার্থ জীবকে শুধু কথার সাহায্যে বশে রাখতে হলে রীতিমত প্রতিভার প্রয়োজন-'ফরমায়েশী গল্প' তাঁর প্রমাণ আছে। 'ঘোষালের হেয়ালি' গল্পটি যথার্থই হেয়ালী। এখানে গল্পের কোন রস নেই। কথক গুলি বিচিত্র চরিত্রের নরনারীকে টেনে এনে পাঁচ মিশেলী-আলোচনা করা হয়েছে। গল্পটির আত্মসচেতন শ্রোতার আসন দখল করেছেন লেখক নিজে-তাই গল্পটির শেষের মন্তব্যটিতে এর স্বরূপ ধর্মের আভাস পাওয়া যায়।

'পুতুলের বিবাহ বিভ্রাট' গল্পটি জমে উঠতে পারেনি- ঘোষালের কথকতার সেই সম্মোহন শক্তিও নেই। ঘোষালের ত্রিকথা সংকলনটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'বীণাবাই'। গল্পটির মধ্যেও একটি গভীর ধ্বনি আছে, যা নিঃসন্দেহে জীবন থেকে উদ্ভূত। সুরপুরের দরবারী পরিবেশ, মার্গসঙ্গীতের সাধন-তীর্থ, বিগাঢ়-যৌবনা শ্বেত বসনা, সঙ্গীত স্বরস্বতী বীণাবাই-সব কিছু মিলিয়ে মধ্যযুগীয় এক রঙীন একটি অসাধারণ পশ্চাৎপট। লেখকের রূপদক্ষতা এখানে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাবাবেগ বর্জিত পরিচ্ছন্ন কথন স্বচ্ছন্দ ও গাঢ়। গল্পরস যে খুব নিবিড় এমন নয়-কিন্তু রচনারীতির ক্লাসিক্যাল বিশুদ্ধ ফরাসী গল্পকারদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পটি পড়ে মনে হয় যে, ঘোষাল শুধূ হাস্যরসিক নন, তিনি একজন দার্শনিক ও বেদনা-রসিকও বটে। নীল লোহিত কমিক, ঘোষাল সিরিয়ো কমিক- এখানে দুজনের মূল পার্থক্য। সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া বলেছেন-'The most civiliesd way of being sad is to be humourous.'- ইহা ঘোষাল চরিত্রের মধ্যে আভাস পাওয়া যায়।

'চার ইয়ারী কথা' প্রমথ চৌধুরীর এক অনন্য কীর্তি। 'চার ইয়ারী কথা' আসলে চারটি বিচ্ছিন্ন ছোটগল্পের সমষ্টি-

436787

Dhaka University Institutional Repository

চারটি বিভিন্ন ছোটগল্প হিসেবেও এর মূল্য কম নয়- চারটি পরিচ্ছন্ন নাতিদীর্ঘ মুক্ত-নিটোল কাহিনী। চারটি বিচিত্র ধরনের প্রেম কাহিনী, একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গের এক একটি অধ্যায় মাত্র। কাহিনী গুলির ফাঁকে ফাঁকে সরস মন্তব্য, সমালোচনা ও বিতর্কের অংশ গুলি আপাত-বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সংযোগ রেখাকে ভরাট করে তুলেছে। গল্পচারটির ভূমিকা অংশটির পরিবেশ-চিত্রণের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে-পরিবেশটির যেন গল্পগুলির মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছে। মেঘ-মুর্ছিত ম্লান আকাশ ও চাঁদের রহস্যাচ্ছন্ন পাণ্ডুর আলো সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন এক প্রেতায়িত ছায়া বিস্তার করেছে। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এক অনির্দেশ ও অপরিচিত সঙ্কেত 'কৌতুহল মিশ্রিত আতঙ্ক' সৃষ্টি করেছে। আসন্ন দুর্যোগের আতঙ্ক পাণ্ডুর পরিবেশ ক্লাবঘরে যে চারটি বন্ধু এতক্ষণ তাসখেলায় মগ্ন ছিল, আকস্মিক দুর্যোগে তারা বাড়ী ফিরতে পারেনি-তাই বৃষ্টি না ছাড়া পর্যন্ত তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলছে।

গল্পগুলির ভাবগত ঐক্য অনুপস্থিত নয়। চারটি গল্পেই প্রেমের অসঙ্গতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রেমানুভূতির সাজে সাবলীল প্রবাহটি এখানে আকস্মিকতার মরুবালির মধ্যে পথ হারিয়েছে। প্রেমের শান্ত ধার মিলনান্তক রূপটি ফুটিয়ে তোলা যেন লেখকের কাম্য নয়-প্রেমকে তিনি একটি অসাধারণ বক্রতির্যক দৃষ্টির সাহায্যেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার বিসর্পিল পথরেখা, উদ্ভট আকস্মিকতা নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি-রোমান্টিক প্রেমানুভূতির বিরুদ্ধে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। প্রথম গল্পে জ্যোৎস্নালোক-মুগ্ধ রাত্রিকে যে কবি কল্পিত মানসি মূর্তি গড়ে ওঠে, তাই উন্মাদিনীর নিষ্ঠুর অট্ট হাসিতে খান খান হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় গল্পে, রূপসী প্রণয়িনীর হীন চৌর্যবৃত্তিতে একটি মোহময় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তৃতীয় গল্পে অস্থির মতি বহুবল্লভ-প্রণয়িনী প্রেম-লীলার পৌঢ়

Dhaka University Institutional Repository

প্রহরে প্রেমিককে আকস্মিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। চতুর্থ গল্পে, পরলোকবাসিনী প্রেমিকার অবরুদ্ধ ও অনুচ্চারিত প্রেমের বাণী টেলিফোনের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিবেদিত হয়েছে। প্রেমের রোমান্টিকতা ও নভোস্পর্শী আর্দশবাদের প্রতি শ্লেষ-চতুর তির্যক দৃষ্টি প্রতিবারই নির্মম আঘাত হেনেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রেমের মোহময় ও সুখালস পরিবেশ প্রথমে ঘনিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত মূহুর্তে সেই রঙ্গিন রসাবেশ ব্যর্থতার ধূলিশয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। এ্যান্টিক্লাইমেক্সের আকস্মিক তীব্র আঘাতে প্রেমের অমৃত ও বিষে পরিণত হয়েছে। রোমান্টিক প্রেম সম্পর্ক তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব অনেকগুলি গল্পের প্রাণ। প্রেমের ভাব গভীরতা ও হৃদয়াবেগকে তিনি নির্মম আঘাত হেনেছেন। 'সেনের কথা' গল্পটির পরিণতিতে যে শেষের ইঙ্গিত আছে, তা যেন অধব্যক্ত, তেমনি সুচতুর। 'সেন' কল্পকাহিনীর মধ্যে তাঁর চিরন্তনীকে পেয়েছেন, কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেই চিরন্তনীকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজতে এলেন। এইখানেই হল রোমান্সের চরমতম অপমান।

'চার ইয়ারী কথা' প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম। প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে কথা কবিদ অন্নদাশঙ্করের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রনিধানযোগ্য, 'চার ইয়ারী থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের রসের জন্যে নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যায়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ-জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া, কিন্তু ওর যে টুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমনি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চার ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার শিশু হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে পথম যৌবনের Swan song গাওয়া হয়েছে ওতে' (বীরবলঃ জীবনশিল্পীঃ অন্নদাশঙ্কর রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমথ চৌধুরী একজন অভিজাত শ্রেণীর লোক। তাঁর রচনায় শুধু উন্নতরুচি ও মননশীলতার অধীকারীদেরকে নিয়ে লেখা এমনটি বলবার অবকাশ নেই। তিনি সমাজের নীচের তলার মানুষকেও তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন। 'ঝাপান খেলা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বীরবল' সমাজের নীচের তলার মানুষ;- কিন্তু অমিশ্র দৃপ্ত 'পুরুষ মানুষ' সে। গল্পের কথক বলেছেন,"আর তার রূপ! অমন সুপুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। সে ছিল কালো পাথরের জীবন্ত এপোলো। পরে গৃহিনীর জিজ্ঞাসায় জবাব দিয়েছিলেন "তুমিও যেমন, ওদের বিয়েই নেই,ত কে কার বউ। আর তা ছাড়া ঝগড়ুকে ত দেখছ, বেটা বাদরের বাচ্চা। আর লখিয়াকেও ত দেখেছ? কি সুন্দরী! সে যে ঝগড়ুকে ছেড়ে বীরবলের কাছে চলে যাবে,এত নিতান্ত স্বাভাবিক। রাধাকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না,- সে কৃষ্ণের কাছে যাবেই যাবে। এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম"। প্রাণ বন্ধু দাসের মত নিম্ন বেতন ভোগী-কেরানীর জীবন কথাও তাঁর রচনা কর্ম থেকে বাদ পড়েনি ('অদৃষ্ট' গল্প)। আবার সমাজের লাঠিয়াল বাহিনীর জীবন চিত্র পাওয়া যায় 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে। নির্মম, পাষাণ ভৈরব নারায়ণের চরিত্র হণনের কাহিনী থেকে ('দিদিমার গল্প') শুরু করে পার্কের প্রমদবালাদের প্রণয়লীলা ('প্রবাস স্মৃতি') পর্যন্ত তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হতে দেখা যায়। ধর্মীয় ভন্ডবাজী ('সারদাদাদার সন্ন্যাস' গল্প), বন্ধুত্বের অবমাননা ('ধ্বংসপুরী' গল্প), ছিচকে চোরের দৃশ্য ('স্বল্প-গল্প'), খাজাঞ্চির বিবাহ বিভ্রাট ('সত্য কি স্বপ্ন' গল্প), দরবেশের জীবন প্রবাহ ('চাহার দরবেশ' গল্প), বাইজীর জীবন চিত্র ('অবনীভূষণের সাধনা সিদ্ধি' গল্প),ঘুষখোরের দন্ড ('জুড়ি ও দৃশ্য' গল্প), সুদ খাওয়ার কুফল ('পূঁজার বলী' গল্প),থিয়েটারের বর্ণনা ('মেরি ক্রিসমাস' গল্প), নৌকার মাঝিদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ ('মন্ত্রশক্তি' গল্প), আমলার প্রেম ('সহযাত্রি'

Dhaka University Institutional Repository

গল্প),পুলিশ বাহিনীর অসাদাচরণ ('সারদাদাদাদার সত্যগল্প' গল্প),পাটের দালালের হঠ্কারিতা ('সীতাপতি রায়'গল্প), মাতাল, জুয়াচোর কোন কিছুই বাদ যায়নি প্রমথ বাবুর ছোটগল্প সাহিত্য থেকে। বিষয় নির্বাচনে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ডঃ অতুল চন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র ভূমিকায় বলেছেন- "প্রথম বয়স থেকেই প্রমথ বাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সে . । আমরা অনেক সময় বলেছি যে, ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী চার কোটি লোককে চেনেন এবং যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তাঁর শরীর ও মনের চেহারা ও ভাবভঙ্গী তাঁর মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তাঁর শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোটগল্পে ছড়ানো রয়েছে"। অতি সাধারণ বা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে প্রমথ বাবু গল্প রচনা করতে পারতেন, কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের এবং তিনি ভাষা নিয়ে খেলতে পারতেন। যে কোন বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর রচনাশৈলী ছিল স্বাতন্ত্রধর্মী এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ছিল সুতীক্ষ্ণ ও ব্যঞ্জণাধর্মী। প্রমথ চৌধুরী জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন কিনা, এ তথ্য বিচারের আগে মনে রাখতে হবে যে তাঁর গল্প খাঁটি আর্টিষ্টের গল্প। তাঁর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন,"আর্টে Content এর মূল্যের চাইতে Form-এর মূল্য ঢের বেশী"১৪। ছোটগল্পের প্রাচুর্যের কারণ ব্যক্ত করে তিনি 'বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধে নিজে লিখেছেন- " এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবত প্রচুর পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোটগল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই ছোট হোক না কেন, তার্ই মধ্যে হাসি কান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোন শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারিনি। ভয়, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য, ভক্তি, ঘৃণা, মমতা, নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা, দ্বেষ, হিংসা, বীরত্ব, কাপুরুষতা, এক কথায় যা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবন-তা মিনি চেয়ারে বসে এ সমাজে সবই মেলে"১৫। এই মানবজীবনের ছবিই এঁকেছেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর বৈচিত্র-প্রচুরতায় নানা উপাদান নিয়ে; কেবল শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যধ্যানী ব্যক্তিত্বের অতন্দ্র মুক্তি-বাসনা রীতি ও মননের অনন্যতায় সেই চিরন্তন জীবন কথাকেই তুলনাহীন নতুন বিশিষ্টতা দান করেছেন রূপে এবং স্বভাবে।

তথ্যসূত্রঃ

১) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়- 'বীরবল ও বাংলাসাহিত্য'-সাহিত্য লোক,৩২/৭, বিডন স্ট্রীট-কলিকাতা-১৯৬০-পৃষ্ঠা নং ২৩।

২) প্রাগুক্ত-'বীরবল ও বাংলাসাহিত্য'-পৃঃ ২৫।

৩) শ্রীভূদেব চৌধুরী- 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'-মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট-কলিকাতা-১৯৬২-পৃঃ ২৬১।

৪) প্রমথ চৌধুরী- গল্প সংগ্রহ-বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ-কলিকাতা-১৩৪৮,২০শে ভাদ্র-পৃঃ ২৩০-২৩১।

৫) রথীন্দ্রনাথ রায়-'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'-জিজ্ঞাসা,৩৩, কলেজ রোড, কলিকাতা-৯, দ্বিতীয় মূদ্রণ ১৯৬৯ ইং-পৃঃ ১১৭।

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'চিঠিপত্র', পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৮০।

৭) 'চিঠিপত্র',৫ম খন্ড-পৃঃ নং ১২৮।

৮) রথীন্দ্রনাথ রায়-'ছোটগল্পের কথা'-পুস্তক বিপণী,২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-১৯৫৯-পৃঃ ৮৮।

৯) The Summing up (Mentor Book Edition) Page ১৩০.

১০) 'নীল লোহিতের আদি প্রেম' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে প্রমথ চৌধুরী কিরণ শঙ্কর রায়কে এ- কথাগুলো বলেন।

১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-'চিঠিপত্র'-৫ম খন্ড প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১২) 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী' প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৬।

১৩) An acre of green grass, Buddhadev Bose.

১৪) সুধীর চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' গল্প সংকলনের ভূমিকাটির নাম 'ছোটগল্প'।

১৫) প্রমথ চৌধুরী-প্রবন্ধ সংগ্রহ-বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান-কলিকাতা-১৯৯৮ পৃষ্ঠা নং ১০৭-১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ঐহিত্য ও উত্ত রাধিকার

প্রাক বৃটিশযুগের বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ মেজাজ আমাদের চোখে পড়ে, তা প্রধানত পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের গ্রামীণ মেজাজ। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য কবিতা, উপন্যাস, রোমান্টিক আখ্যায়িকা, নাটক প্রভৃতির মধ্যেও এই পল্লীকেন্দ্রিকতার আশা আকাঙ্ক্ষাই ঝংকৃত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে সাহিত্যে কখনও কখনও যে নাগরিক জীবনের ছায়া সম্পাত না ঘটেছে, এমন নয়। তাছাড়া নাগরিক বৈদগ্ধ ও রুচিরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের গ্রামীণ মেজাজের মধ্যে নাগরিক মানসিকতার যে স্পন্দন শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় তা খুব স্থায়ী হয়ে বসতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর মতো নাগরিক মননের লেখকের ভাগ্যে যে জনপ্রিয়তা ঘটে উঠবে না, তাতে আর বৈচিত্র্য কি?

অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রপোষিত সাহিত্যে মাঝে মাঝে নাগরিক চৈতন্য ছায়াপাত করেছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রমুখের কবিতায় নাগরিক মেজাজ আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যে অসংস্কৃত গ্রাম্যকবির সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তির পাশে বুদ্ধিমার্জিত, বহুপঠন পরিশীলিত মননও অলক্ষণীয় ছিল না। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের এই জনবিরল পথের পথিক। দরবারী সাহিত্যের শেষ রশ্মিটুকু তার রচনায় মুছে যায়নি। পঞ্চ গৌড়েশ্বর রাজা শিব সিংহের সভাকবি কবি বিদ্যাপতির কাব্যে রাজ সভার ঐশ্বর্য, মধ্যযুগীয় বিলাস বিভ্রম, নাগরিক জীবনের হাবভাব লীলাচার্তুয প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভার মধ্যে স্বাভাবিকত্ব কম ছিলনা।, কিন্তু তাঁর কলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রযত্নের যে অভাব ছিল না, তাঁর প্রমাণ তাঁর কাব্যে সুপরিস্ফুট। তা ছাড়া জয়দেবের 'বিলাসকলাসু কুতুহলম' এর উত্তরাধিকার ও তিনি পেয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক গ্রামীণ মেজাজের সঙ্গে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের তফাৎ যেন অনেকখানি। বিদ্যাপতির কাব্যের রচনারীতি ও মানসপ্রকর্ষ, শব্দবিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা নিপুণ প্রয়োগ, উক্তি প্রত্যুক্তির আবেগবিরল তীক্ষ্ণাগ্র শরপাতন রাজসভার সাহিত্য ও নাগরিক প্রকাশ নিপুণতার পরিচায়ক।

বিদ্যাপতির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কালগত ব্যবধান কম নয় দীর্ঘ চারশো বছর। কিন্তু বিদ্যাপতির মধ্যেই যেন ভারতচন্দ্রের পিতৃপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই যুগসঙ্কটকালে ভারতচন্দ্রের কাব্যে আসন্ন কাল বৈশাখীর মেঘ দুর্যোগময় রাষ্ট্রীয় পটভূমিকা খরতর বিদ্যুৎদীপ্তিতে বিলসিত। "অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলীয়মান নবাবী আমলের দিগন্ত সীমায় মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, কলিকাতা ব্যাপী যে ষড়যন্ত্রের গোপন বিষের ছবি ঝলসিত হয়ে উঠেছিল, সেই ষড়যন্ত্র সঙ্কুল নর্মলীলার বিষাক্ত কৃষ্ণনগরের নাগরিক ভারতচন্দ্র। অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকারন্তে সে যুগের ঐহিকতার তীব্রজ্জ্বল মদিরাই তিনি পরিবেশন করেছেন"। কিন্তু তাঁর কত চাতুরী, কত নিপুণ কথার বিস্তার, নতুন ছন্দের চমক,শব্দসৃষ্টির অভিনবত্বে, শেয বিদ্রুপ ব্যঙ্গের হৃদয়হীন অথচ অম্ল মধুর রূপায়ণে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক মানসিকতাকে ফুটিয়েতুলেছেন। অসামান্য বাঙনির্মিত, আঙ্গিক-সচেতন শিল্প দৃষ্টি, নানা বিদ্যার অনুশীলন ভারতচন্দ্রকে প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। জীবন রসের গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি, কিন্তু জীবনের বহিরাশ্রয়ী লৌকিক তরঙ্গভঙ্গকে নিপুণ বানীবিন্যাসে রেখায়িত করে তুলেছেন। অষ্টাদশ শতকের নাগরিক জীবনের ভালমন্দ সবটুকুই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্মরসিকতা, সুমার্জিত বিদ্যবত্তা, কথা-সরনিপুণতা একদিকে,অন্যদিকে ভাষার ও কারুকরণের অবিকম্পিত রেখাবিন্যাস ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কথা-কলারশিল্পকে তিনি অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের নাগরিক জীবনের আর একটি দিকও ছিল। বিলীয়মান মোঘল শাসন ও নবাবী আমলের পতনোন্মুখ আভিজাত্যের মধ্যে নৈতিক কলুষতা যে বিষনিশ্বাসী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল ভারতচন্দ্রের সূক্ষ্ম চতুর কাব্য ভাষনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ কৌটিল্য, ষড়যন্ত্রের বহু বঙ্কিমপথ, অন্তঃপুরিকার দেহ সর্বস্ব গোপন প্রেমলীলা নাগরিক জীবনের ক্লেদ পিচ্ছিল পথরেখা ভাষার বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম ওষ্টাধরের তীক্ষ্ণাগ্র হাসি এই জীবনের সহচর। একশো আশি বছর পরে ভারতচন্দ্র কথা কোবিদ প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, প্রবন্ধে ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি"। ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ ও হাস্যরস প্রমথ চৌধুরীকে ভারতচন্দ্রের অনুরাগী করে তুলেছে। তাঁর মতে ভারতচন্দ্রের ভাষা সরল ও তরল। তাঁর অশ্লিলতাকে শোধন করেছে প্রাণবন্ত হাস্যরস।

অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল সময়টাকে মোটামুটি ভাবে ইংরেজীর প্রাথমিক কাল বলা যেতে পারে। ইতোমধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করে নাগরিক চৈতন্যের অভ্যুদয় হয়েছে। গীতি কবিতা ও রোমান্টিক আখ্যায়িকামূলক কবিতার মধ্যে বিকৃতরুচি নাগরিক জীবনের কুলষ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমনকি ভবানী বিষয়ক ও কৃষ্ণ বিষয়ক মানেও ইহ-স্বর্বস্বতার সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই

Dhaka University Institutional Repository

কবি গোষ্ঠীরই উত্তর সাধক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহা সর্বস্বতা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ প্রবণতা, যুক্তিবাদী সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব, বাগবৈদগ্ধ্য প্রভৃতি নাগরিক চৈতন্যের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় লক্ষণীয়। সমকালীন দেশ, কাল ও সমাজকে তিনি কৌতুহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সামাজিক বিদ্রূপমূলক রচনাগুলির মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ্যের কলকাতার অনুকরণ প্রিয়তা, স্ত্রী-শিক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ব্যভিচার, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রভৃতি তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর তিনি মন্তব্য করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতের ফলে বাঙ্গালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই বাণীবদ্ধ করেছেন। তিনি জার্নালিষ্ট ও কবি, তাই তিনি তাঁর যুগের পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের নাগরিক চৈতন্য ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ-নিপুণতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিজাত মননের পার্থক্য কম নয়। কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা স্থূল সীমায় উঠেছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অনুচিত মন্তব্য অনেক সময় তার রসিকতাকে নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামীতে পরিণত করেছে। তা ছাড়া তাঁর মতামতের মধ্যে প্রচুর পরস্পর বিরোধী কথা আছে। তিনি ছিলেন প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংঘ যুগের কবি। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচ্য প্রাশ্চাত্য সমন্বয়ের আদর্শ দেখা দিয়েছিল, তা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। সর্বশেষ নব্য বিদ্যার আলোকে তাঁর মন পরিমার্জিত ছিল না। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে প্রথম 'কলিকাতার কবি'ঈশ্বর গুপ্তের শব্দচাতুর্য ও বক্র তির্যক দৃষ্টিকোন ছাড়া আর কোন বিষয়ের তুলনা করা যায় না। সময়ের ব্যবধান তো বটেই, তা ছাড়া মানসিকতার ব্যবধানও কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গুলির মধ্যে নক্সা শ্রেণীর রচনা, আখ্যায়িত শ্রেণীর রচনা ও হাস্যরসাত্মক কবিতা এই ত্রিধারাই অভিব্যক্তি হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে তুলনা করতে হলে সে কালের ব্যঙ্গ প্রধান রচনার সামাজিক পটভূমিকা জানা প্রয়োজন। উনিশ শতকের নগরমন্য মানুষের আচার আচরণের অসঙ্গতিকেই কৌতুকের বিষয়বস্তু করে তোলা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের অসঙ্গত মিশ্রনের ফলে জীবনের ক্ষেত্রে যে সব কৌতুককর অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই এ যুগের কোন কোন লেখায় শরাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁদের মধ্যে খ্যতিনামা লেখক ছিলেন।

ভবানীচরণ, প্যারীচরণ ও কালীপ্রসন্নের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কতকগুলি মূলগত প্রভেদ আছে। ভবানীচরণ স্পষ্ট তাই সমাজ সংস্কারের জন্য লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় সে জাতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিলনা, কারন তিনি জানতেন, "সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনা নয় ও গুরুর হাতের বেতও নয়"। সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষা দান বা মনোরঞ্জন কোনটাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত উনিশ শতকের এই খ্যাতনামা হাস্যরস-স্রষ্টাদের সঙ্গে তার মূল প্রভেদ ছিল দৃষ্টিকোণের। কোন একটি বিশেষ পরিবার ব্যক্তি বা কেলেঙ্কারীর কাহিনীকেই তারা মূলত তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছিল। 'হুতোম প্যাচার নকসা'র মধ্যে এমন একটা ছবি আছে যা অবিকল বাস্তবের ছবি। প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিকোণ প্রশস্ততর ও ক্ষেত্রও বৃহত্তর। আঘাত প্রবণতার চেয়ে মনের কৌতুকোচ্ছলতাই অধিকতর পরিস্ফুট। নতুন করে গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের ঘিঞ্জি গলি, ময়লা নর্দমা, পূঁজা উৎসবের অন্তরালে যদৃচ্ছ কামোন্মত্ততা তারই টিকাকার সে কালের এই লেখক গোষ্ঠী। তারপর প্রায় একশো বছর চলে গেছে সে দিনের বাদ প্রদিবাদের বিষয়বস্তু পুরানো ব্যাপারে পরিনত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশকের লন্ডন প্যারিসের নাগরিক জীবন যাত্রা, অকসফোর্ড পার্কের বসন্ত বিহ্বলতা, জ্যোৎস্না মূর্ছিত সীন নদী, গর্ডন স্পোয়ারে রূপসী পরিচালিকার গোপন প্রেম, ইউরোপীয় জীবন যাত্রার বিচিত্র প্রাণস্পন্দন একালের নাগরিক জীবনের ভাষ্যকারকে নতুন রসে দীক্ষিত করেছে। এবারে সমাজ রক্ষার জন্য লেখনী সঞ্চালন নয় বিসাক্ত নৈতিক জীবনের রসিয়ে বলার কৌশল ও নয় এবারের পথ স্বতন্ত্র। পরিচ্ছন্ন ড্রয়িং রুমে বা হাতের দু আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে অবসর সময়ে দু'চার জন নির্বাচিত বিদগ্ধ জনের সঙ্গে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পালিশ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রমনীয় করে বলা। হাসি শব্দও উচ্চ কণ্ঠ নয়- কথার মারপ্যাঁচে চোখের আলোকে, ওষ্ঠাধরের বঙ্কিম রেখায় উইট স্যাটায়ার, প্যারাডকস প্রভৃতি সবগুলি বীরবলী হাস্যরসের প্রকরণ আভাসিত হয়ে ওঠে। ভবানীচরণ বা কালী প্রসন্নর হাসিতে এ আভিজাত্যের থাকা সম্ভব নয়।

পঞ্চানন্দ ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এর নাম বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইন্দ্রনাথের অভিনব ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা বাংলা সাহিত্যে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্দ্রনাথের চুটকি জাতীয় রচনা ও সংক্ষিপ্ত টিকা টিপ্পনীর মধ্যেই যেন তার প্রতিভার রূপধর্মের পরিচয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তার হাস্যরসকে টেকচাঁদ, হুতোম এবং দীনবন্ধুর হাস্যরসের চেয়ে উচ্চাসন দিয়েছেন। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি অন্তরালে তার নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গি ও আন্তরিকতা ছিল। নব্য হিন্দুধর্ম আন্দোলনের ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী সুর তার রচনায় ছিল। ইন্দ্রনাথের হাস্যরসের মধ্যে কিছু অভিনব ছিল তিনি পাশ্চাত্য হাস্যরসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইন্দ্রনাথের প্রভাবেই বিদ্রূপাত্মক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরসে কিন্তু অদ্ভুত উদ্ভট চিত্র, বীভৎসরস ও আতিশয্যের পরিচয় আছে। সে যুগের বঙ্কিম প্রভাবিত নব্য হিন্দু ধর্মের আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী হয়েছিল এই শ্রেণীর উদ্দেশ্যমূলকতা যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় অনুপস্থিত নয়। অতিরঞ্জন চিত্রণ বা caricature চিত্রণে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গের সঙ্গে অদ্ভুত রসের মিশ্রন প্রচেষ্টায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির প্রকৃতিটিকে সামান্য দু একটি ইঙ্গিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন "এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি Mock-heroic প্রনালী অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল| Byron এর Don Juan বা Beppo-র রসিকতা, এমনকি Dickens এর হাস্যরস সৃষ্টি Lamb এর মত এত সূক্ষ্ম ও নিগুঢ় হইতে পারে না- ইহাদের মধ্যে কতকটা ভাঁড়ামি, কতকটা সভ্যরুচি-বিগর্হিত উচ্চাহাস্যধ্বনির অশোভন তীব্রতা ও অসংযমের প্রাধান্য থাকবেই"।

সমকালীন লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পথ ছিল একটু স্বতন্ত্র। তাঁকে ঠিক স্যাটায়ারিষ্ট বলা সঙ্গত নয়। তাঁর হাস্যরস কৌতুক হাস্যের সমপর্যায় ভুক্ত, মাঝে মাঝে হিউমারে শুভ্রোজ্জ্বল বিচ্ছুরণ প্রসন্ন শরৎকালের মুক্তপক্ষ বলাকার মতো সঞ্চরণশীল। কঙ্কাবতী ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠরচনা। রূপক, রূপকথা অসম্ভব উদ্ভট চরিত্র ঘটনাসংস্থানের সঙ্গে সহজ কৌতুকরসের সমন্বয়ে ত্রৈলোক্যনাথ রসসৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া তিনি ব্যাক্তি বিশেষকে আক্রমণ করেনি; তিনি টাইপ চরিত্রকেই আক্রমণ করেছেন ।অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশরীতি তাঁর হাস্যরসকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। কথা সাহিত্য হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি মাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নতুন অসঙ্গত পরিস্থিতির উদ্ভাবন কৌশল। ত্রৈলোক্যনাথ এ বিষয়ে নিপুণ শিল্পী। কিন্তু তাঁর হাস্যরসে জ্বালা নেই, সর্বত্র হৃদয়তা ও করুণা একটি স্নিগ্ধ মধুর পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভাষার পরিচ্ছন্নতাও হাস্যরস সৃষ্টির অনুকূল। হৃদয়াবেগপূর্ণ বাস্পবিহবল অপরিস্ফুট কণ্ঠ তার নয়, স্পষ্ট। পরিস্কার ঋজুগতি তাঁর ভাষা। এ ভাষা একই আধারে সাধু ভাষা ও কথ্য ভাষার দাবী মিটিয়েছে। এই ভাষা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার অর্ধনারীশ্বর ভঙ্গিটি হাস্যরস সৃষ্টির অনুকূল। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রূপের পথ তাঁর নয়,তার পথ রূপক-কথায় নির্দোষ উদ্ভট রসের সঙ্গে বিশুদ্ধ কৌতুক মিশিয়ে এক স্নিগ্ধ সহৃদয় হাসির পথ।

ইন্দ্রনাথের চুটকি প্রিয়তা প্রমথ চৌধুরীর রচনার মতোই উপভোগ্য। পঞ্চানন্দ ছদ্মনাম নিয়ে ইন্দ্রনাথ সাময়িক সামাজিক জীবনের ওপর নানা মন্তব্য করেছেন। 'বীরবলের টিপ্পনী' রচনায় প্রমথ চৌধুরী ও সমসাময়িক রাজনীতির ওপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে টিপ্পনী করেছেন। অবশ্য এ দুয়ের মধ্যে প্রকারভেদ আছে নিশ্চয়ই। ইন্দ্রনাথ ফরাসী স্যাটায়ারের রস বাংলায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছিলেন।কিন্তু তাঁর যতটা সাধ ছিল, ততটা সাধ্য ছিল না। ফরাসী স্যাটায়ারকে তিনি বাংলা সাহিত্যের অতিনমনীয় পলিমাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। তাঁর কারণ ফরাসী স্যাটায়ার শুধু 'বহ্নি পড়িয়া' লেখা সম্ভব নয়। ফরাসীর সাহিত্যের হাস্যরস ফরাসী জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরসের বিষয়বৈচিত্র্য খুব বেশী নেই-তার কারণ বৃহত্তর জীবনের সম্পর্ক সেখানে পড়েনি। ফরাসী সাহিত্যের হাস্যরস তারঁ শব্দভেদী বান দিয়ে জীবনের মর্মতলকে শুধু বিদ্ধই করে না, উদ্ভাসিতও করে তোলে"। হাস্যরসের এই প্রকৃতিকে প্রমথ চৌধুরী অভ্রান্ত ভাবেই বুঝে ছিলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণকে অপরকে অপ্রিয় কথা বলার মধ্যে থাকে ক্রোধদ্ধতা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধও ছিল আর্ট। তাই তিনি বাক্যকে মেজে ঘষে হাতিয়ার তৈরি করেছেন-কারণ তিনি হাসির শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন "ফরাসী জাতি হাসতে জানে তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুবাক্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক"। নব্য হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল; তারই অনিবার্য ধারক এ যুগের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচয়িতারা। প্রমথ চৌধুরীর আমলে সংস্কার আন্দোলনের উম্মত্ততা থেমে গিয়েছে। তথাকথিত ধর্মসম্পর্কে তার এমন কোন ব্যক্তিগত মতামত ছিলনা । কোন কিছু তার স্বরে প্রতিবাদন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সহজমুগ্ধ স্নিগ্ধ হাসি তার রচনায় অনুপস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সরল, নির্দোষ কৌতুকহাস্য-কতাটা শিশুর নিষ্কলুষ হাসির মতো। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর হাসি বুদ্ধিনির্ভর চতুর ও মর্মভেদ হিউমার জাতীয় হাসি তাই তার স্বভাব বিরুদ্ধ। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সহৃদয় স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন সম্ভব অসম্ভবের রাজ্য ছাড়িয়ে মানুষ পশু ভুত প্রেত এক করে দিয়ে 'একঠেঙ্গোমুলুকে' তাঁর জ্যোৎস্নারঞ্জিত দীর্ঘছায়া বিস্তার করেছে। প্রমথ চৌধুরীর হাসি বুদ্ধিধর্মী বাকচাতুর্য নির্ভর-অসম্ভব ও অবাস্তবকে আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়। ত্রৈলোক্যনাথের জগৎ তাঁর এলাকার বাইরে ছিল। তিনি বলেছেন " আমরা রূপকথা লিখতে বসলে হয়তো কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা রূপকথার জন্ম সত্য যুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে। এই রূপকের মধ্যে হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরূপকথা হয়ে দাঁড়ায় Gulliver's Travels".

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। শুধু তাই নয়,হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একটি শ্রেণী। হাস্যরসের কৌলীন্যের ও আভিজাত্যের সর্বপ্রথম রূপকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র-ই"। তাঁর সাহিত্যগুরু গুপ্ত কবির প্রভাবও তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। দীনবন্ধুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রসিকতার আভিজাত্য হারাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিবোধ ও মাত্রাজ্ঞান ছিল অসাধারণ তাই হাস্যরসকেও ভারসাম্য ঠিক রেখে শিল্পে পরিণত করতে পেরেছিলেন। হাস্য রসিক বঙ্কিমচন্দ্র নিরাসক্ত হতে পারেননি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে গিয়ে নিজেই যেন জড়িয়ে পড়েছেন। ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের অনেক স্থলেই ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের পথিক। হাস্যরসিক বঙ্কিমবাবু বুদ্ধি ও হৃদয় দু পথই ব্যবহার করেছেন, প্রমথ চৌধুরী সেখানে পরিমার্জিত বুদ্ধির পথই অবলম্বন করেছে-তাই তাঁর হাসিতে উইট, স্যাটায়ার, পান, ফান প্যারাডক্স প্রভৃতি সব কিছুই আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ হিউমার (Humour) নেই। তিনি জীবনে বা সাহিত্যে কোথাও ভাবালুতা বা হৃদয়াবেগের সমর্থক ছিলেন না, দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রোমান্টিকতা-বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসে তাঁর হৃদয়াবেগ কল্পনার উত্তাপে বিগলিত হয়ে রংধনুর মতো মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে-তার কল্পনাসমৃদ্ধ মনই হাসির আলোড়নে ময়ূরের মতো বিচিত্র বর্ণের কলাপ বিস্তার করে। এই কল্পনার সম্পদ প্রমথ চৌধুরীর ছিল না বরং অনেক সময় কল্পনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপই করেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে কখনো কখনো ট্রাজিক সুরও আচে, কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাসক্ত স্রষ্টামাত্র। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ফরাসী গুরুদের মতো মূলত "ক্রিটিক্যাল অবজারভার অব দা হিউমান ইকোলজি" বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজের ব্যক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিকে নিপুণ ভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সেখানেও তিনি অনেক সময় নিরাসক্ত দ্রষ্টার আসন থেকে নীচে নেমে এসেছেন। প্রমথ চৌধুরী যে কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর নির্লিপ্ততা। তাঁর ছোটগল্পগুলির চরিত্র হাস্য পরিহাসে আন্দোলিত বিচিত্র ঘটনাচক্রে সঞ্চারিত, কিন্তু এর কোনটিই যেন তাকে স্পর্শ করে না। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত নেশাখোর ও অর্ধোন্মাদ হয়েও মিথ্যে কথার জাল বুনতে অপরাগ যা দেখেছেন যা বাস্তবিকই ঘটেছে, তাকেই অবলম্বন করে তিনি তাঁর অহিফেন নেশাগ্রস্ত কল্পনাকে উচ্ছাসে-আবেগে ফেনায়িত করে তোলেন। যত তুচ্ছই হোক না কেন, সামান্যতম বাস্তব ভিত্তি অন্তত থাকা চাই-যেটুকু না থাকলে কমলাকান্তের পক্ষে দপ্তর রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু নীললোহিত ও ঘোষাল স্বতন্ত্র-তারা শূণ্যে মিথ্যের সৌধ রচনা করতেই পারদর্শী।বাক চাতুর্য ঘটনা-সাজানোর কৌশল ও মিথ্যেকে সত্যের মতো প্রতিপন্ন করানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। প্রমথ চৌধুরীর হৃদয়াবেগ বর্জিত বুদ্ধি কৈবল্য বা Varbal wit এর ওপরেই নির্ভরশীল-তাই তাঁর সবটুকুই আলোকোজ্জ্বল-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আলোছায়ার লীলা এখানে নেই। প্রমথ চৌধুরীর শব্দের খেলা যেন উজ্জ্বল কঠিন ধাতব টঙ্কার, বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দধ্বনিতে জল-তরঙ্গের মৃদু মূর্ছনা।

বিংশ শতাব্দীর হাস্যরস প্রধান সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সামাজিক বিদ্রূপের পটপরিবর্তন। 'সোশ্যাল স্যাটায়ার' উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এমন কি বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু তারপর নতুন দিকে মোড় ফিরেছে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের একটি নতুন দিক উন্মুক্ত হলো। খুব সচেতনভাবে ফরাসী হাস্যরসের প্রাণবন্ত উৎসকে উন্মুক্ত করে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মোলিয়েরের একাধিক নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী হাস্যরসিকের হাস্যরস সৃষ্টিররূপ ও রীতি বাংলা নাটকে পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে মোলিয়ের থেকে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ বিশী তাদের হাস্যরসের অনেক সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন ধারার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যোগাযোগের যে কয়েকটি সেতু আছে, মোলিয়ের রসিকতা তাঁর মধ্যে অন্যতম। প্রমথ চৌধুরী ভাষার দিক থেকে যেমন ভলতেয়ারকে ফরাসী প্রতিভার চরম বলে স্বীকার করেছেন, তেমনি সামগ্রিক প্রতিভার দিক থেকে মোলিয়েরকে ফরাসী প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ বলে স্বীকার করেছেন। "মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সমুখে খাড়া করে দিয়েছেন"। উনিশ শতকের শেষার্ধের সংস্কৃতিবান বাঙ্গালীদের মধ্যে ফরাসী সাহিত্য চর্চার যে ধারা লক্ষ্য করা যায়, প্রমথ চৌধুরীতে এসে তাই পরিণতি লাভ করেছে।

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানকে তিনি একাধিক বার সপ্রশংস অভিবাদন জানিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িকদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউমারিষ্ট। তাঁর হাস্যরসের নিগূঢ় মর্মমূলে কোথায় যেন বেদনার উৎস আছে। কেদারনাথের হাস্যরসের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তার মধ্যে বাঙ্গালী জীবনের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়-এমন কি অশীতিবর্ষীয় লেখকের সপ্রচুর রসধারা, প্রাণধর্মে ও মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। বাক সংক্ষিপ্ততার মধ্যে সুদূর প্রসারী ধর্ম তাঁর ছোট গল্পকে অসাধারনত্বে মন্ডিত করেছে। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলির মধ্যে শাণিত-দীপ্ত উইট ও প্যারাডক্সের এক একটি চতুর শরাঘাত বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কেদারনাথের গল্প গুলিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুবলায়িত একটি গল্পাংশ থাকে, চৌধুরীর গল্প গুলিতে আখ্যায়িকার অংশ নিতান্ত ক্ষীণ-বলেবর। মূলগল্পের চেয়ে তর্কবির্তকের অংশই বেশী, মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয় গল্পের চেয়ে এই তর্কবির্তকের মূল্য বেশী, এবং এই বিতর্কধর্মী কথার খেলার ওপরই তাঁর গোটা গল্পের কাঠামো ও হাস্যরসের ভিত্তি।

প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরস সৃষ্টির প্রসঙ্গে সমকালীন আর একজন শক্তিশালী হাস্যরস স্রষ্টার কথা মনে পড়ে, তিনি হলেন 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কৃষ্ণকলি' প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত রচয়িতা রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম। তির্যক মন্তব্য ও কথার খেলা পরশুরামের রচনায় যে নেই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সংলাপের মতো তার ওপর তিনি অতিরিক্ত জোর দেন না-পরশুরামের সংলাপ প্রমথ চৌধুরীর সংলাপের মতো জটিল ও প্যাঁচালো নয়। বাক্‌চাতুর্যের চেয়ে তিনি মনুষ্য চরিত্র ও ঘটনার অসামঞ্জস্যের ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। চমকপ্রদ আকস্মিকতা, চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টির মৌলিকতা বিস্ময়কর। পুরাণকে আধুনিক কালের লৌকিক জগতে দাঁড় করিয়ে আধুনিক কালের কোন কোন সমস্যাকে তিনি আলোকিত করে তুলেছেন। নতুন উদ্ভট শব্দ ও নামকরণ বিষয়েও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী প্রধানত বাক চাতুর্যের ওপরই তার ভিক্তি রচনা করেছেন, পরশুরামের হাস্যরসের মূল ভিত্তি উদ্ভট পরিস্থিতির উদ্ভাবনে ও বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টির মৌলিকতায়। তাই যেখানে প্রমথ চৌধুরীর গল্প গুলি একই বিন্দুতে কথার কসরতে মত্ত, পরশুরামের গল্প সেখানে স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিণতির শেষ বিন্দুতে এসে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েছে। হাস্যরস রচনায় পরশুরামের আভিজাত্য কম নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর চেয়েও তিনি নির্লিপ্ত। প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের কথার কত ভ্রূভঙ্গী, কত বহুবঙ্কিম আর্বত-এখানে প্রবাহের চেয়ে আবর্তই যেন বড়, সূর্যকরজ্জ্বোল জলের অতি চতুর বহুরেখ-ভ্রবিলাসই সেখানে লক্ষ্যণীয়। পরশুরামের ছোটগল্পের কথার স্বাচ্ছন্দ প্রবাহ আছে কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের মোড় ফেরার অতর্কিত কৌশল সে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহের অনায়ত্ত নয়-প্রবাহ যেখানে বৃহত্তর পরিণতির সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রোজ্জ্বল ফেন রেখায় সূক্ষ্ম সুমিত বুদ্ধির আলোক চক্র।

আমাদের সংস্কার, ভালোলাগা মন্দ লাগার পেছনে দীর্ঘকালের একটি ইতিহাস থাকে। দীর্ঘকালের আচরিত রুচিকে এক মুহূর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তাও পরিবর্তিত হতে বসেছে। ইংরেজীতে অবশ্য 'Formal(ফরমাল) ও 'Informal'(ইনফরমাল) এই দুটি বিভাগের মাধ্যমে বহু পূর্বেই প্রবন্ধসাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালের সাহিত্যবিচারের মানদন্ডে এই দুটি মূল বিভাগের মধ্যে কতক গুলি ছোট ছোট উপবিভাগ দেখা দিয়েছে। এই দু বিভাগের সারথ্য করেছেন ইউরোপের দুজন কৃতকর্মা গদ্যলেখক মোঁতেন ও বেকন। মোঁতেনের রচনাবলী বেকনের রচনাবলীর সমসাময়িক। দুজনই রেনেসাঁর মানুষ, কিন্তু তাঁদের রচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন মোঁতেন পন্থী। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধাবলীতে মোঁতেন প্রভাবিত রীতির পরিচয় আছে। তিনি বেকনের বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের পথ অনুসরণ না করে ফরাসী গুরুর পথই অনুসরণ করেছেন। ষোড়শ শতকের এই সুভদ্র, অন্তরঙ্গ মানুষটি যে ভাবে কথা বলেছেন আজকের দিনেও তার দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। বেকনের রচনায় বিজ্ঞানবুদ্ধি, ইহসর্বস্বতা ও জ্ঞান সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত মননশীলতা উদ্ভাসিত-কিন্তু রচনাগুলি বিষয়মুখী, বেকনের অন্ত জীবন সেখানে নেই। তার সমসাময়িক ফরাসী লেখক মোঁতেন কিন্তু ভিন্নমার্গের সাধক। তাঁর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য নেই, তাঁর বিষয় দুটি। প্রথমত মোঁতেনের জীবন দর্শনের নানা শ্রেণীর আলোচনা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মোঁতেনের অন্তরঙ্গ চরিত্রের অকুণ্ঠিত উদঘাটন। ' আমি আমার রচনার বিষয়বস্তু' অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা তার রচনার মধ্যে তিনি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

মধুর ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। মনটাকে বন্ধনমুক্ত করে খেয়াল খুশীর ঝলকে অনুরূপ করে তুলতে পারলেই পাঠকের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা সম্ভব। মোঁতেন গোটা ফরাসী জাতকেই যেন এই অন্তরঙ্গ দীক্ষা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী তার এই শ্রেণীর রচনার নাম করেছেন 'খেয়াল পাতা'। কিন্তু যেমন তেমন খেয়াল তার এখনো ভুক্ত নয়-খেয়ালকেও আর্ট করে তোলা চাই, খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। "খেয়াল যতই কার্দারী করুক না কেন তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তার নেই"।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মোঁতেন ছাড়াও আরো কয়েকজন বিদেশী লেখকের কথা মনে পড়ে। ইংরেজী নাট্যকার বার্নাড শ'র রচনারীতির সুস্পষ্ট প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বিদ্যমান। বার্নাড শ'র নাটকে সমাজ সমালোচনার উদ্দেশ্য তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ রয়েছে। প্রচলিত নাট্যরীতির অনুসরণ না করে তিনি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর নাটকের প্রধান ঐশ্বর্য সূক্ষ্মচতুর বুদ্ধি মার্জিত সংলাপ। মর্মভেদী ব্যঙ্গ ও অদ্বিতীয় বাগবৈদগ্ধ এই সংলাপকে তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উপযুক্তবাহন করে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে শ-সুলভ দীর্ঘভূমিকা সংযোজনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া শ'র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাতিয়ারের উপরও তাঁর আকর্ষণ ছিল। 'ফরমায়েশী গল্প' এ সূত্র সংক্ষিপ্ত গল্পাংশটুকু চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে তর্ক-বিতর্কের ধূলিজালে শঙ্কিত ও শীর্ণ অবশেষটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। মূল গল্পটির চরিত্র চিত্রণ বা পটভূমিকা দীর্ঘ বিন্যাস চমকপ্রদ বিতর্ক তার গল্পগুলির প্রাণ।হাস্যরস সৃষ্টিতে ও ছোটগল্প রচনার দিক দিয়ে তিনি বার্নাড শ'র পন্থা অনুসরণ করেছেন। "আমি ঘোষালের মুখে এ প্রস্তাব শুনে বুঝলুম কথাটা নেহাৎ বাজে। সে বলতে চায় গল্প। আর এ প্রস্তাব তার গল্পের ভূমিক মাত্র। ও সে ভূমিকা জি,বি, এস, এর নাটকের ভূমিকার মত, যার অস্থায়ীর সঙ্গে অন্তরার কোন মিল নেই"।

Dhaka University Institutional Repository

জি, কে, চেস্টরটন (১৯৭৪-১৯৩৬) ও ম্যাক্স বিয়ারবম (১৮৭২-১৯৫৬) সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর তুলনা নানাদিক দিয়ে প্রধানযোগ্য। জি, কে, সি, বিচিত্র মননের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। সংলাপের চাতুর্য, মন্তব্যের সূক্ষ্মতা, উপস্থিত বুদ্ধির চোখ ধাঁধানো জৌলুস চেষ্টারটনের রচনারীতিকে সজীব ও অন্ত রঙ্গ করে তুলেছে। রচনারীতি ও মনোজীবনের এই বিশিষ্টতার জন্যেই সম্ভবত তিনি বানার্ড শ'র অন্তর্জীবনকে এত অভ্রান্তভাবে বুঝেছিলেন। চেষ্টরটনের হাস্য-পরিহাস একটি গভীর সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার উপায় মাত্র। নিজের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্যকে প্রতিপাদন করার জন্যই তাকে বিদুষকের মুখোস পরতে হয়েছিল। চেষ্টারটনের তুলনায় প্রমথ চৌধুরী এই দিক দিয়ে যথার্থই লঘু ও তারল্যধর্মী-চেষ্টারটনের স্ফুলিঙ্গের কাছে প্রমথ চৌধুরীকে অনেকটা নিষ্প্রভ বলে মনে হবার কারণ যথার্থ নয়।

বিচিত্র প্রতিভাধর ম্যাক্স বিয়ারবম (১৮৭২-১৯৫৬) উনিশ শতকের শেষ দশকেই খ্যতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও এই কলাকুশলী লেখকের খ্যাতি বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। খুব কম লেখকই এই দু'শতাব্দীর পাঠককে একই সঙ্গে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছেন। বিয়ারবম সেই মুষ্টিমেয় লেখকদের একজন। ক্যারিকেচার শিল্পকে তিনি তার প্রথম গ্রন্থেই চূড়ান্ত করে তুলে ছিলেন। 'জুলিকা ডবসন' (১৯১১) কাহিনীটিতে তিনি সূক্ষ্মতর কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। চেষ্টারটনের মতো কথাসাহিত্য রচনায় তিনি কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মিশ্রধর্মী পথ অবলম্বন করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মিশ্রধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিয়ারবম সমকালীন যুগমানসের তীক্ষ্ণধী সমালোচক। বিয়ারবমের মতোই প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনার রীতি অবলম্বন করেননি, 'বীবলের হালখাতা' গ্রন্থের প্যারোডি-ভঙ্গিম রচনাগুলি বিয়ারবমের রচনার মতো অভ্রান্ত লক্ষ্য ও গভীর সঞ্চারী নয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বক্তব্যের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মনের লঘু স্পর্শ সঞ্চারণের আধিক্য লক্ষণীয়। "শ, চেষ্টারটন, বিয়ারবম,এই তিনজনই খ্যাত লেখকের মানসপ্রকর্ষের ছাপ তাঁর ওপরে পড়েছিল মাত্র, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ জায়গা ছাড়া তাঁর রচনাকে অন্তত এ তিন জনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগভীর ও ভঙ্গি প্রধান বলেই মনে হয়"। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শ., চেষ্টারটন, বিয়ারবমের তুলনায় তাঁর অসুবিধাও ছিল প্রচুর। প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যের অনভ্যস্ত মাটিতে নতুন ধরণের ফসল ফলাতে হয়েছিল। ইংরেজ লেখকদের তুলনায় বাংলা গদ্যের সহজ নমনীয় ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে এ কাজটি আরও দুরূহ ছিল। দ্বিতীয়ত এঁদের তুলনায় চৌধুরী মহাশয়ের মানসপরিধি ছিল অনেকখানি সংকীর্ণ। তবু প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের বলিষ্ঠতা কম নয়, তিনি বাংলা গদ্যের গীতিগন্ধী মন্থরগতি সুকুমার ধারাটির সঙ্গে চেষ্টারটনীয় দীপ্তি আনতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরের গড়ে ওঠা ফরাসী গদ্যের মেজাজ আনতে। এই দিক দিয়ে তার ব্যর্থতার মূল্যও কম নয়।

উত্তরসাধকগণ

গল্প রচনার ধারাকে আবেগের (Emotion) এর চিরাগত সৃজনভূমি থেকে এনে বুদ্ধিদীপ্তি (Intellect) এর আলোকে প্রখর কলালোকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করলেন,-ছোটগল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এটুকু প্রমথ চৌধুরীর সর্ব শ্রেষ্ঠদান। গল্পের দ্যুতিময় আঙ্গিকে পরিকল্পনার প্রতি শিল্পির অবদান সম ধিক হলেও প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে জীবন-বিষয়ের অপ্রাচুর্য ছিল না কখনো;

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের পরিকল্পনা সৌন্দর্য (Schematic beauty) তাঁর চিত্তের মুখ্য আকর্ষণ হলেও বিষয়বস্তু (Theme) এর প্রাণময় দাবিকেও তিনি অস্বীকার করেননি। পরবর্তী কালের স্বভাবত-মননশীল কিছু কিছু শিল্পী এই বৃদ্ধি প্রধান রূপ-বিন্যাসের খেলায় সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। বলা বাহুল্য এঁদের প্রায় সকলেই চৌধুরী মহাশয়ের মননোজ্জ্বল র্দুলভ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ সচেতন হয়েছিলেন। তাই বলে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই প্রমথ ভক্ত এই সব উত্তরসাধক সকলেই তার রচনার প্রকৃতি বা পদ্ধতি হুবুহু অনুসরণ করেছিল। বস্তুত অনন্যতুল্য স্বতন্ত্রতাই হচ্ছে প্রতিভার স্বভাবধর্ম। ফলে প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের যে সব শিল্পী বরণীয় তারা সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের অনুবর্তনে স্বতন্ত্রতাঋদ্ধ গল্প রচনা করেছেন। কেবল প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তিত পথে গল্প-শরীরের পারিপাট্য বিধানে এঁরা সকলেই সবিশেষ মননশীল এইটুকুই এই শিল্পী গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী সাধারণ সদৃশ্যতার উপাদান"। এ পথে কারো রচনায় গল্পের বিষয়বস্তু (Theme) একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়েছে, পরিপাটি নকশা (scheme)এর বৌদ্ধিক বিন্যাসই হয়েছে একমাত্র উপজীব্য।কেউ বা গল্পের সংহত জীবনাবেদনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসম্ভব হলেও সত্য (Paradoxical) কথামালার কথকতাধর্মী বৈঠকি বাগবিন্যাসে। আরো-কেউ আবার সংহত গল্পের ঘটনা (Plot) বর্ণনার আধার হিসাবে বেছে নিয়েছে মিশ্র বিচিত্র রূপাবয়বের কাঠামো। তবু সকলেই গল্প রচনার ক্ষেত্রে আবেগ (emotion) এর সঙ্গে সমান বা শ্রেষ্ঠতর আসনে বসিয়েছেন বুদ্ধিদীপ্তি (intellect) কে ও বিষয়বস্তু (theme)এর চেয়ে গল্পের পরিকল্পনা সৌন্দর্য (schematic beauty) কেও নিম্নতর আসন দেননি, এই অর্থেই তারা প্রমথ চৌধুরীর গল্প শিল্প-প্রবণতার অনুব্রতী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গল্প সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সচেতন স্বীকৃতিময় অনুসৃতি যাদের মধ্যে প্রকট, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২) তাঁদের অন্যতম অগ্রণী। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকায় শিল্পী লিখেছেন, "সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য"। বলাই বাহুল্য এটুকু তাঁর সচেতন মনের বিনয়। তাহলেও-অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর এক শ্রেষ্ঠ অনুব্রতী হওয়া সত্ত্বেও, ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবেই গুরুর অনুমত ছিলেন না। 'অন্তশীলা'র আলোচ্য ভূমিকা এই সত্যই ব্যক্ত করতে চেয়েছে। অন্যপক্ষে যে মননশীলতার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম যৌবন সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়েছিল, তাকে 'সবুজপত্রের দল' নামে পরিচিত করে শিল্পী অন্যত্র লিখেছেন, "এই দলের গোটা কয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান"। বস্তুত তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে এই দুই ধারার প্রতিফলনই সুতীব্র। একই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "বুদ্ধিবাদ অর্থ (১) চরিত্র শক্তি ও ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার; (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটা কয়েক রীতিনীতি আছে এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়"। আশ্চর্য যথার্থদৃষ্টি ও আত্মৈষণার সঙ্গে শিল্পী তার পরিচয় দিয়েছেন- "সব চেয়ে বেশী ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি"।

'সবুজপত্রের দল'-এর অপরাপর সভ্যের চেয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ সম্বন্ধে এ মন্তব্যের সত্যতা সমধিক; আর এখানেই গুরুর গল্প-শৈলীর সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে নিছক বুদ্ধিদীপ্ত (Intellectual) বলবার উপায় নেই। জীবনের অপার-বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় সহৃদয় জীবনানুভবের

Dhaka University Institutional Repository

ওপরে বুদ্ধির দীপ্ত-মার্জিত স্মিত আলোকে প্রতিফলিত করেছেন তিনি। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত,-তাঁর নিজেরই ভাষায় 'বাস্তবতার কবল থেকে মুক্ত' জীবন থেকে-সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত'। যথার্থ অর্থে তাঁর চেতনা এক অনুপ্রেক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর। তাই বলে তাঁর গল্পসাহিত্য বা ব্যক্তি-অনুভবকে নির্জীবন বলার উপায় নেই।

অতএব সমাজের বিশেষ জীবন-প্রেক্ষিত পরিবর্ধিত হয়ে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় কারো নেই। সীমিত এমন কি অনভিপ্রেতও যদি হয়, তবু ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার গন্ডিতেও জীবনের ভাব-বেদ্য অস্তিত্ব (emotional entity) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর গল্পে জীবনায়নের যে পার্থক্য, তা প্রধানত তাদের অন্তর্লীন attitude বা মনোভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্লট-এ সহানুভূতি স্নিগ্ধ জীবন অভিজ্ঞতার অবতারণা ঘটেছে তার স্বতন্ত্র মূল্যে, প্রসঙ্গত সেই অভিজ্ঞতার শরীরে শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবত্তার দীপ্তি প্রতিফলত হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে পট এর ভূমিকা বুদ্ধির আলোকে প্রতিফলনের মাধ্যমে হিসেবে, তাঁর গল্পের লক্ষ্য বুদ্ধিবাদের অবাধ মুক্তি,-প্লট কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তাঁর ভাব-সচেতনতার কাছে সে পটের মূল্য কোন গল্প দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিসেবে, এর চেয়ে বেশী কোন জীবন-মূল্য তাঁর নেই।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর এক বিশ্বস্ত লেখক হিসেবে সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) অবশ্য স্মরণীয়। কবিতা, লঘু-গুরু প্রবন্ধ, নাটিকা ও গল্প রচনার বিচিত্র ধারায় ইনি লেখনী চালনা করেছিলেন। 'গল্পের জন্যই গল্প' সৃষ্টি সতীশচন্দ্রের উদ্দেশ্য (motto') ছিল না। যে কোন উপলক্ষ্যে গল্প বলে একটি নীতিগভীর সহজ সেন্টিমেন্টাল মুহূর্ত গড়ে তোলার প্রতিই যেন তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল। তাই, 'দাঁড়কাক', 'তিনপাখী' ,'তুক' বা

Dhaka University Institutional Repository

'ডাংপিটে' থেকে শুরু করে 'সতীর জেদ', মাতৃহীন ইত্যাদি লঘু-গুরু যে কোন বিষয়ই অনায়াসে তাঁর গল্পের বিষয় হতে পেরেছে। অধিকাংশ গল্পই প্রকরণের দিক থেকে এক নাতি-উজ্জ্বল স্বত:স্ফূর্তির সহজ রসে মন্ডিত। গল্প বলার পেছনে শিল্পীর মনের কোন গুরুত্বপূর্ণ মনোভঙ্গি (serious attitude) ছিল না। 'সতীর জেদ' (১৯২৪) গল্পে সংকলনের 'নিবেদন'-এ তাঁর নিজের মুখের স্বীকৃতিই রয়েছে-এ-বিষয়ে, - " নেই কাজ খৈ ভাজ'-এমনি ভাবেই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল"। ফলে সিরিয়াস গল্পগুলিও যথেষ্ট সিরিয়াস হতে পারেনি, সহাস গল্পগুচ্ছ যথেষ্ট লঘু হতে পারলেও প্রকরণের দিক থেকে সুচিন্তিত পরিমার্জন বা বৌদ্ধিক সূক্ষ্মতা আয়ত্ত করতে পারেনি, প্রমথ পরিমন্ডলের যা ছিল অপরিচ্ছেদ উপাদান। যদিও লেখক বলেছেন তাঁর " দুয়েকটি গল্পের ছাটকাট" প্রমথ চৌধুরী " আগ্রহের সঙ্গে দেখে দিয়েছেন"। ফল কথা, কি হাসির গল্প, কি সিরিয়াস গল্প সর্বত্রই অনপেক্ষিত-চিন্তনে সহজ স্বত:স্ফূর্ত গল্প জমিয়ে তোলার দিকেই ছিল লেখকের প্রধান ঝোঁক। হাসির গল্পে সিচুয়েশন-এর সরস নিষেক ধাপে ধাপে বাড়িয়ে চড়িয়ে দিয়ে চরম মুহূর্ত অপ্রত্যাশিত চটকে হাস্যরসকে জমাট স্তূপীকৃত করে তোলা হয়েছে। (যেমন' ঘোমটা গল্প)। অন্যপক্ষে সিরিয়াস গল্পে যে কোন ক্ষীণতম কাহিনীকে সুলভ সেন্টিমেন্ট-এ জমিয়ে তোলার দিকে ছিল শিল্পীর একান্ত ঝোঁক। ফলে কোন কোন সময় গল্পে প্লট এর ভাগ যেন শূণ্য হয়ে গেছে, অনেক সময় হয়েছে অস্পষ্ট। তাতে গল্প ধরেছে নিছক সেন্টিম্যান্টাল কথিকার আকার (যেমন 'মাতৃহীন', 'অবুঝব্যথা' প্রভৃতি গল্প)। সতীশচন্দ্রের গল্পের কলা-কৌশল ছিল তাঁর সহজ স্বভাবের অঙ্গ। অন্যপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলী আসলে তাঁর দুর্লভ মননশক্তির রুচিসূক্ষ্ম কর্ষণের ফল। সতীশচন্দ্রের রচনায় মননের চেয়ে আবেগধর্মী মনের খেলার বিস্তার ও বৈচিত্র বেশী। তাঁর সৃষ্টির প্রকরণে সহজ পরিমিত বোধ রয়েছে,-কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত চিন্তার সুকল্পিত পরিমার্জনা নেই। কিন্তু যথাপরিমিত ও যথৌচিত্যবুদ্ধির যে স্বতঃস্ফূর্তি ছিল শিল্পীর সহজ ভূষণ, তারই বিশিষ্টতার 'সবুজপত্রের' বিদগ্ধ পরিমন্ডলে সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সুচিরস্থায়ী।

বাংলার সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে বিশ্বপতি চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৮) এক বেদনার বিস্ময়। মাত্র একখানি উপন্যাস 'ঘরের ডাক' লিখে বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিস্ময়ের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। কথাসাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পের জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠার আসন চিরস্মরণীয় হতে পারত অনায়াসে। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দুঃখ করেছেন,-কেবল " আলস্য প্রিয় স্বভাবের দরূণ সে সম্ভাবনা সমুচিত ফলপ্রসূ হয়নি"।

শিল্পীর বিচিত্র সৃজনপ্রবাহের মধ্যে কথাসাহিত্যই জন্মের বিচারে সর্বজ্যেষ্ঠ। যদিও কোন গল্পই প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ দাবি করতে পারেনি, তাহলেও প্রায় প্রতি গল্পেই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস (Wit) এর সঙ্গে আবেগ (emotion) এর সমন্বয় বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মকে যুগপৎ আন্দোলিত করে তোলে। এ দিক থেকে লেখককে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সমধর্মা বলে মনে করা যেতে পারে।

গাল্পিক বিশ্বপতি কথার রসিক। তাঁর বৈঠাকী কথার তরঙ্গ, জমাট গল্প আর আন্তরিকতাপূর্ণ তর্কের দীপ্তি সকল শ্রোতাকেই মুগ্ধ করেছে উদাহরণ-'দু' দুবার গল্পটি। "আমার বয়স আজ ষাট কি তার চেয়েও দু'এক বছরের বেশী হবে, কিন্তু এখনও আমি নিজেকে যুবা বলে মনে করি"। এই তীর্যক বাক্যের (Paradox) এর চমক দিয়ে গল্পের শুরু। আর কথার জটপাকানো সেই চমকের ঘোর কাটাতে নায়ক তার জীবন কথা বলেছেন গল্পে। বিষয়বস্তু (Theme)এর বিচারে গল্পটি traged (করুণ)।

Dhaka University Institutional Repository

"পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে-মাথার সেবাও মন্দ হয়নি। কিন্তু বুকের সেবা আজও বাঁকি আছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটেছে; হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু আবদার শুনবার সাধ আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে"।এখানেই শিল্পী বিশ্বপতি চৌধুরীর স্বভাব প্রকাশ। ওপরের শেষ দু'টি অনুচ্ছেদে গল্পকে তার Paradox ব্যাখ্যার আদ্যন্ত প্রসঙ্গে বিন্যস্ত করে সেই অনুভবের উত্তাপকে ফিকে করে দিতে চেয়েছেন। বিশ্বপতি চৌধুরীর ব্যক্তি স্বভাবও এমনি।জাত-শিল্পীর মতো নিরতিশয় স্পর্শকাতর তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মনের আবেগ-অনুভব; কিন্তু সেই সহজ emotion -কে তিনি চিরকাল সযত্নে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন Wit-এর দীপ্ত হাসি দিয়ে। এখানেই নিজ স্বভাবের অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী।

বাংলা গল্পের জগতে বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯ খ্রীঃ) আর্বিভাব 'সবুজপত্রের অনেক পরে হলেও প্রমথ চৌধুরীর স্নেহসিক্ত সান্নিধ্যের নিবিড়তা তিনি লাভ করেছিলেন। শিল্পীর মনোধর্মের অনন্যতায় বিমল প্রসাদ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ প্রমথ অনুচর হয়েও তিনি প্রমথগোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন নি। নিজের শিল্পী রীতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই খুব জোড়ের সঙ্গে বলেছিলেন-"আমি কোন দলের নই, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমায় জড়িয়ে দেয়ার কোন সংগতি নেই"। তারপর আর একদিন শান্ত সিগ্ধ স্বরে বলেছিলেন, 'তা প্রভাব পড়েছে বৈ কি, -খুবই পড়েছে। আমাদের মন গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীর মাঝখানে। দুজনের ছাপই পড়েছে লেখায়, তবে সচেতন ভাবে নয়'। নিজের সম্বন্ধে শিল্পীর এই দ্বিতীয় অভিমতকেই যথার্থ বলে মনে করি। আর সেই যৌথ প্রভাবের পরিণামী ফলশ্রুতীতেই তার স্থান প্রমথ চৌধুরীর, অনুব্রতী গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের জগতে রূপ-অন্বীক্ষাটি বা রূপ-দর্শনাটি বিমলা প্রসাদের মনে প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ দান। গল্পের অঙ্গে বিভিন্ন শৈলীর সমন্বয় বিধানের চেষ্টাতেই শুধু নয়, প্লট-এর বিন্যাস ও বিস্তার, চরিত্রের ক্রম সংগঠন বিষয়বস্তু (Theme) এর পরিকল্পনা ও গ্রন্থন-সকল দিকেই পরীক্ষামূলক সন্ধিৎসা তাঁর শিল্পী মনের এক স্থায়ী প্রবণতা। এই বিশেষ আচরণ (Attitude) প্রমথ চৌধুরীর কাছে পাওয়া। অনেক গল্পের প্লট বা থিম এর নির্দেশনাও দিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী'; যেমন বিমলা প্রসাদ নিজে স্বীকার করেছেন ' বৈঠকী' গল্প সম্বন্ধে। প্রমথ চৌধুরী' একদিন বললেন, 'একালে তোমরা বৈঠক বসাতে জান না, তাই বৈঠকী গল্পও আর জমে না'। এই কথার সূত্রে 'বৈঠকী' গল্পের জন্ম-একসপেরিমেন্ট এর আকারে। গল্পের দেহে অপরাপর সমধর্মী শৈলী সমাবেশের উৎসাহেও তিনি দিয়েছিলেন।

সাধারণ গন্ডী পেরিয়ে শিল্পী তাঁর গল্পে কখনো রূপক, কখনো কাব্যঞ্জনাধর্মী সাংকেতিকতার স্বাদও পরিবেশন করেছেন। এই বিচিত্র স্বাদুতা বিমলা প্রসাদের স্বতন্ত্র মনের সৃষ্টি হলেও তার বৈচিত্র্যময় রূপাধার গড়বার প্রেরণা এসেছে প্রমথ চৌধুরীর মনন সান্নিধ্যের প্রভাবে। এ সত্য তিনি নিজেও স্বীকার করেন।

অপরপক্ষে রবীন্দ্র-প্রভাবে বিগাঢ় হতে পেরেছে বলেই শিল্পীর মনের সহজাত প্রত্যয় প্রবণতা ধূর্জটিপ্রসাদ বা প্রমথ চৌধুরীর থেকে ভিন্ন হলেও একথা স্বীকার্য যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় আশ্চর্য সজীবতা রয়েছে যাতে একই বুদ্ধিদীপ্ত (Intellectual) বাচনভঙ্গিকে পরিপাট্য বিন্যাসের গুণে নিত্য নতুন মনে হয়। কিন্তু বিমলা প্রসাদের গল্পে গল্পে ভাষার নতুন স্বর, নতুন স্বাদ-গল্পের form ও content কে অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিতার সূত্রে সংশিষ্ট (Synthesise) করে তোলাই তার প্রধান আকাঙ্খা-আর তারই সাফল্যে তার সার্থকতাও।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়ের কথা, যে হাতে কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) সর্বজয়ী অহিংস সেনানায়কের সংগ্রামী হাতিয়ার ধরেছিলেন, সেই হাত দিয়েই বাজিয়েছিলেন মধুস্যন্দী বাঁশের বাঁশরী; সংখ্যায় প্রচুর না হলেও কিরণশঙ্কর রায় ছোট গল্প লিখেগেছেন,-মর্মস্পর্শী নিবিড়তার গুণে যা কেবল বাঁশির সুরের সঙ্গেই তুলনীয়। 'সবুজপত্রে' তাঁর একাধিক গল্প পত্রস্থ হয়েছিল। তাহলেও প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতীদলে গল্পকার কিরণশঙ্করের আসন অনন্য স্বাতন্ত্র্যের গুণে অনেকখানি দূরান্বিত। সুরশিল্পের পরিভাষায় চৌধুরী' মহাশয়ের গল্প-শৈলীর পরিচয় দিতে হলে বলব,-"তাঁর হাতের লেখনী ছিল বিশুদ্ধি,-তেমনি নিখুঁত চমকপ্রদ কারুকার্য। কিন্তু কিরণশঙ্করের গল্পে যেন গায়ের মেঠো সুরের মিঠে বাঁশির তান;-তাতে অন্তরের তপ্ত উদ্বেল প্রাণশক্তি যত নিবিড়, বাগভঙ্গির কলাকৌশল তত সচেতন চাকচিক্য মার্জিত নয়"। এক কথায় 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর শিল্প স্বভাবকে যদি বিদগ্ধ বলা চলে, তাহলে কিরণশঙ্করের রচনা প্রধানত অনুভব গভীর।

দেশের ঐতিহ্য, তার ভালমন্দ, সার্থকতা-দীনতা, আধি-ব্যাধি, অশিক্ষা-দলাদালি, সব কিছুর সঙ্গেই দেশকে তিনি ভালবেসে ছিলেন-তার মুক্তি সাধনায় করেছিলেন সর্বস্বপণ। তাঁর গল্প রচনাতেও দেখি দেশ হিতব্রতী এই মৌল চেতনারই এক নতুনতর অভিব্যক্তি। ফলে তাঁর সকল গল্পেই রয়েছে চোখে-দেখা সমাজ-জীবনের এক বাস্তব প্রচ্ছদ, 'সবুজপত্রগোষ্ঠীর বুদ্ধি প্রধান শিল্পীদের রচনার পক্ষে যা প্রত্যাশিত নয়। অন্যপক্ষে গল্পের আঙ্গিক বিন্যাসে ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাধারণ প্রবণতাও তাঁর রচনার অবয়বে প্রকট নয়। সর্বোপরি প্রায় সকল গল্পে বিষয়বস্তুতেই বহমান জীবনের প্রতি মমতাঘনিষ্ঠ এক আবেগ-অনুভবের গাঢ়তা রয়েছে, প্রখর বুদ্ধিদীপ্তি (Intellectual highbrows)দের পক্ষে যা

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবত বরণীয় হতে পারে না। আত্মার মূলগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বভাবধর্মে কিরণশঙ্কর শহুরে বা একান্তভাবে মস্তিষ্কজীবী ছিলেন না-ছিলেন হৃদয়বান, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি জীবন লোকের অধিবাসী। অন্তরগত এই মৌল পার্থক্যের সূত্রেই তার গল্পরচনার প্রকৃতি এবং আকৃতি বুদ্ধি-প্রধান গল্প-শিল্পপ্রকরণের থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও সদৃশতার লক্ষণের অভাব ছিল না। কারণ গ্রামীণ জীবনভূমির মধ্যে আবাল্য কৈশোর পরিবর্ধিত হলেও স্বভাব বৈশিষ্ট্যে কিরণশঙ্কর 'গ্রাম্য' ছিলেন না। নিজেকে শহুরেপনার একান্ত অঙ্গীভূত না করেও নাগরিক চেতনার পারিপাট্যবোধ এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুভব প্রকাশের কালেও সুমিত সংযমের শাসন-রশ্মি প্রয়োগের রুচি-স্নিগ্ধতা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল বিরাগ, কোন অনুভবের অভিব্যক্তিতেই অমিশ্র উচ্ছাদের প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোথাও নীতি-তীব্র ব্যঙ্গের বক্রোক্তি, কোথাও স্বভাব বর্ণনার গাঢ়তার মাধ্যমে অন্ত রের ভাব বাসনাকে তিনি সুমিত যথোচিত রূপ দিয়েছেন। প্রকাশ ভঙ্গীর এই শালীন স্নিগ্ধ পরিপাট্যের নাগরিকজনোচিত রুচি-সূক্ষ্মতার গুনেই তিনি 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ একজন।

'কাহিনী' গল্পের প্রকৃতি প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' গল্পের থেকে-যদিও এ-দুয়ের বিষয় ও আকৃতিগত সাদৃশ্যতার কথা মনে না হয়ে যায় না। 'হেয়ালী' নামক গল্প রয়েছে কথিকার প্রকৃতি, যা 'লিপিকা'র রচনাশৈলীর সদৃশ হয়েও নয়। অর্থাৎ কিরণশঙ্করের সব রচনাই তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে-মনের সঙ্গে মননের ঐতিহাসিকের বস্তু-নিষ্ঠার আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে কবির প্রত্যয়াবেগে ঘনসন্নিবিষ্ট যৌথ জটিল শিল্প-সুষমার সমন্বয় করে। ফলে তার রচনা অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তির রূপ সাদৃশ্যতা বহন করলেও,-শিল্পি কিরণশঙ্কর একক নিঃসঙ্গ কারোই অনুমত নন তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। রথীন্দ্রনাথ রায়- 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'
(পৃষ্ঠা নং ৪৪)
২। ভারতচন্দ্র, 'নানাচর্চা'।
৩। 'সাহিত্যে খেলা' বীরবলের হালখাতা।
৪। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়।
৫। ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়।
৬। 'শিশু-সাহিত্য', বীরবলের হালখাতা ।
৭। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্কিম চন্দ্র' নামক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৮। 'খেয়াল পাতা', বীরবলের হালখাতা।
৯। প্রমথ চৌধুরী'-গল্প সংগ্রহ-বিশ্বভারতী গ্রন্থভারতী-কলিকাতা-১৩৪৮ বাং, গল্প 'ঘোষালের হেয়ালি'-পৃঃ ৩৬৪
১০। প্রাগুক্ত-রথীন্দ্রনাথ রায় 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'-পৃঃ ৭০
১১। শ্রীভূদেব চৌধুরী'-বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার' (পৃষ্ঠা নং ২৭৪)
১২। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-'নতুন ও পুরাতন'- দ্র. 'বক্তব্য'।
১৩। তদেব-'নতুন ও পুরাতন' -দ্র. 'বক্তব্য'।
১৪। দ্র. পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-'চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব)
১৫। প্রাগুক্ত-'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' পৃঃ ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন / উপসংহার

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার যুগে অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের রচনায় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য যতটা দেখা যায়, তার রচনায় ততটা নেই। পরিবর্তে এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের স্রোতধারা। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও গতিবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেনি। চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে তিনি বলিষ্ঠ জীবনবাদ, তারুণ্য শক্তির বন্দনা, স্বাজাত্যপ্রীতির পরিবর্তে সংকীর্নহীনমন্যতাকে ঘৃণা করে প্রগতির সঙ্গে রক্ষণশীলতাকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। তাই তাঁর রচনায় স্বদেশী আদর্শ রক্ষার সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের নবজীবনের উন্মাদনা বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। আবার যুদ্ধোত্তর যুগে হতাশা কিংবা সমকালিন রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর রচনায় প্রধান স্থান জুড়ে বসেনি। তাঁর গল্পের চরিত্রের চলনবলন, স্বদেশী আন্দোলনের প্রচ্ছায় লাভ করে নতুন আঙ্গিক ও বিদেশী সাহিত্যের সঞ্জীবনমন্ত্রে দিক্ষিত হয়েছে। জাতি-বর্ণ-ভেদ-প্রথা তাঁর গল্পের মূল আবেদনকে ক্ষুন্ন করেনি। ১ম মহাযুদ্ধের পরে সাহিত্যে নিরন্ন-বঞ্চিত বেকারদের জন্য যে সহানুভূতি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তাঁর প্রকাশ খুবই সামান্য। সহাস্য রসিকতা, বাক্ চাতূর্য তাঁর ছোটগল্পের প্রাণ। তাঁর গল্প সাহিত্যে সমাজের উঁচু তলার মানুষদের সুখ দু:খের কথার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়াল, খেয়ানৌকার মাঝি (গল্প-'মন্ত্রশক্তি'), গাড়োয়ান-কোচম্যান (গল্প- ঝোট্রন ও লোট্রন'), সন্ন্যাসী (গল্প-'সত্য কি স্বপ্ন'), হাড়ি-ডোম-মেথর (গল্প-'ঝাপান খেলা'), পালকি বেহাড়া (গল্প-'আহুতি'), বাইজীর কথা (গল্প-'বীনাবাই'), আর্থিক অনটনের কথাও স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোটগল্পের আগমন অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির তুলনায় বিলম্বিত হলেও পাঠকহৃদয় জয় করার ব্যাপারে এর কৃতিত্ব অধিকতর। বর্তমানকালের জীবনের জটিলতায় সাহিত্যে রসপিপাসা নিবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ছোটগল্পের উপযোগিতা অন্যান্য সাহিত্য শাখাকে ছাড়িয়ে গেছে। একালে আর মহাকাব্য রচনা করা যাবে না। প্রমথ চৌধুরী' নিজে এটিকে "পরগাছাফুল-১" বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলাকা কাব্যগ্রন্থে বলেছেন 'গতিই জীবন'। ফরাসী দার্শনিক বেঁগসকে অনুসরণ করে তিনি বলাকা কাব্যে বলে উঠলেন 'হেথা নয়, অন্য কথা, অন্য কোন্‌খানে'। এই গতি, ঝঞ্ঝাময়তাই ছাপা হল প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধিক লিখনেতে। প্রমথ চৌধুরী' বর্তমান সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে বলেছেন 'প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তি গুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেরে যাবে, আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মতো উচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে'। যেটি মহাকাব্য তার মধ্যে বলা বাহুল্য থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র সংস্করণের মধ্যে সে অবকাশ নেই। ক্ষুদ্র সংস্করণের সঙ্গে জীবনের গতিময়তার একটি মিল রয়েছে। সুতরাং এখনকার পরিচিত যে রূপ সেটি হল ক্ষুদ্রায়তনের রচনাসমূহ। ক্ষুদ্রায়তনের রচনা সমূহের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণস্থান দখল করে আছে ছোটগল্প।

এবারে আসা যায় প্রমথ গল্পের মূল্যায়নে। বাংলা ছোটগল্পে প্রমথ চৌধুরীর অবদান বৈশিষ্ট্য এক উলেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তাঁর গল্প সমূহ ছোটগল্প না হলেও তাতে ছোট গল্পের খোরাক রয়েছে-এ কথা যেমনি সত্য তেমনি গল্প বিন্যাস রীতিও এতে রয়েছে। "সব কথার শেষে কৌতুহলের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করতে হয়,-বিচিত্রভঙ্গিতে গল্প লিখেছিলেন চৌধুরী' মহাশয় নানা অ-সদৃশ্য বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু তাঁর সকল গল্পেরই আঙ্গিক ও রসপরিমাণগত ফলশ্রুতি প্রায় অভিন্ন-২"। অর্থাৎ, কোনগল্পই পূনাঙ্গ ছোটগল্পই হয়ে উঠতে পারেনি কেবল একান্ত রূপ সংহিতর অভাবে,-বস্তুত তাঁর সব গল্পই ছোটগল্প, প্রবন্ধ বা ব্যক্তিত্বধর্মী রচনা এবং কথিকার রূপ মিশ্রতা রেখেছে। মনে হয় শৈলী সিদ্ধাশিল্পীর আত্মার আকুতি বুঝি ছিল এইরূপ বিমিশ্রনের প্রতি। তাই গল্পের একদেহে অনেক আঙ্গিকের যৌথমন্ডলের কলাকৌশলে শিল্পীর অভিনব এক রমনীর মূর্তি গড়ে তোলার সাহিত্য খেলা খেলে গেছেন তিনি বাংলা গল্পের ইতিহাসে। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা,-তাঁর অনন্যতাও।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রমথ বাবুর ছোটগল্পেরই এক নতুন মূল্যায়ন।

'রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার-প্রভাবিত বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর গল্প ব্যতিক্রমধর্মী। স্বীকার্য, তা কলানিপুণ, বিদগ্ধ ও মননঋদ্ধ'।-৩

ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, 'বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ' গ্রন্থে বলেছেন-"প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে সর্ব প্রথম যা চোখে পড়ে-তা হল আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য। সচেতন এক বক্তা এবং সমমনস্ক একটি মজলিশ গড়ে তুলেছে তাঁর গল্পের পরিবেশ-৪"। এ রকম মজলিশ ত্রৈলক্যনাথের ছোটগল্পগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। ত্রৈলক্যনাথের মজলিশটি ছিল গ্রাম্য, বহুলাংশে অমার্জিত মধুর জীবন রসে স্নিগ্ধ। প্রমথ চৌধুরীর মজলিশটি নাগরিক, বিদগ্ধজনের আড্ডা। তাই তর্কে ব্যাঙ্গে, মার্জিত রুচিতে এবং বাক্ পটুত্ব বা কথার খেলাতে সে মজলিশের মেজাজ ভিন্ন। এই মজলিশী মেজাজ গল্পগুলিকে আলাদা

Dhaka University Institutional Repository

স্বাদুতা দিলেও-গল্পের ভাবকে জীবন বোধের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছাতে দেননি। আড্ডায় সেই গভীরতাকে স্পর্শ করা সম্ভবও নয়। বিদগ্ধ-হৃদয় সংবেদ্য হওয়ার ফলে প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প সর্বসাধারণের কাছে তেমন সমাদৃত হয়নি। তবু স্বীকার করতেই হয় তাঁর গল্পের আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য এ যুগের আঙ্গিক প্রধান ছোটগল্পের পথ প্রদর্শক। যদিও স্মরণে রাখতে হবে উপস্থাপনার সচেতনতা, বিশেষণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও তার্কিকতার প্রাধান্য থাকলেও প্রমথ চৌধুরী'র গল্পের মূলে সক্রিয় ছিল তাঁর বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও বিবিধ শ্রেণীর মানব-চরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যজীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর গল্প আলোচনা করতে গিয়ে চেকভের প্রসঙ্গ তুলেছেন-"চৌধুরী' মহাশয়ের গল্পে তিনি চেকভের ছোটগল্পের আস্বাদন পেয়েছেন-৫"। চেকভের প্রতিভা ছোটগল্প লেখকের প্রতিভা, ছোটকাহিনীর বা কাহিনীর ভগ্নাংশ ও স্বল্প রেখ কয়েকটি চরিত্র নিয়ে তিনি অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করতে পারতেন। প্রমথ চৌধুরীও জীবনের খন্ডাংশের শিল্পী। কিন্তু চেকভের গল্পগুলির মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম গতিস্পন্দন আছে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তা অনুপস্থিত । চেকভের গল্পগুলির মধ্যে করুণ লাবন্য আছে, আছে এক মধুর বিষন্নতা। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির রেখাঙ্কন স্পষ্ট-গীতিকাব্যোচিত ব্যঞ্জনাও নেই। চেকভের গদ্যের সূক্ষ্ম সুরেলা রূপ এখানে নেই, কিন্তু দু'জনেই অত্যন্ত সামান্য উপাদান থেকেই অপূর্ব গল্প রচনা করতে পারতেন। প্রমথ চৌধুরী' যেখানে যুক্তিবাদী, রোমান্টিকতা-বিরোধী চেকভ সেখানে জীবনের করুণ সুরের বিষন্নতার মধ্যে একজাতীয় গভীরাশ্রয়ী বেদনার উৎস আবিষ্কার করেছেন। চেকভের তুলনায় প্রমথ চৌধুরী' গদ্যাত্মক। প্রমথ চৌধুরী চেকভ বা মোপাসাঁ নন, এর জন্য ক্ষোপকরার কিছু নেই, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই মত, এটিই সবচেয়ে বড় কথা। রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী' গ্রন্থে বলেছেন "প্রমথ চৌধুরীর গল্প বিচারের আগে মনে রাখতে হবে যে তাঁর গল্প খাঁটি আর্টিস্টের গল্প"।

প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সব গল্পে ঘটনার চেয়ে মন্তব্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে, রসের চেয়ে বুদ্ধির চমক পাঠকের মন টানে। চরিত্রকে সৃষ্টি করার চেয়ে প্রচলিত ঢঙের চরিত্রকে নাকাল করাতেই লেখকের উৎসাহ, বিদ্রূপ করাতেই তাঁর আগ্রহ। গল্পের মোড়কে প্রমথ বাবু বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ জীবন সমালোচনা উপস্থিত করেছেন। তাঁর গল্পে রসাক্ত সুমিষ্টতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। তাঁর গল্পের জগৎ "উজ্জলতার বাতায়ন-সেখানে মধ্যাহ্নের আলো অনাবৃত-৬"। প্রমথ চৌধুরী' আমাদের জানিয়েছেন, গদ্য রচনাও আর্ট, তা যত্নসাধ্য,,সাধনা সাপেক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন ভাষা যখন গদ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। বাংলা গদ্যকে তিনি দিয়েছিলেন জীবনী শক্তি। যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। ফরাসী গদ্যে এই জীবনী শক্তির প্রাচুর্য দেখেই প্রমথ চৌধুরী সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় যে বীরবলের প্রয়াস বিফল হয়নি। "বড়কে ছোটর ভিতর ধরে রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য"। আমাদের বাংলা ঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারত বর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন- "গৌড় ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করার সাধনাই হোক আমাদের জীবন সাধনা-৭"। এটি প্রমথ বাবুর মূল বক্তব্য। বীরবলী ঢঙের দীপ্তি ও দাহ সমভাবে বিদ্যমান, বুদ্ধির খেলা, শব্দ চতুর প্রয়োগ, শেষ-বক্রোক্তি বিরোধাভাসের নিপুণ বিন্যাসে বীরবল গদ্যরীতিকে

Dhaka University Institutional Repository

অনন্যতা দিয়েছে। উইট বা প্যারাডক্স, প্যান, স্যানিটি, ক্ল্যারিটি, রিজন প্রভৃতি বীরবল ঢঙের ভিত্তি মূল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রমথ চৌধুরীর গল্পমাত্রই পালিশ করা, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত-৮"। প্রমথ চৌধুরীর গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা, সমালোচনা যতই থাকুক না কেন, আধুনিক কালের বাংলা গল্পে শুদ্ধ-স্বতন্ত্র রূপচিরন্তনের পথ প্রবর্তক তিনি। আধুনিক বাংলা গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ কথা যেমনই সত্য, ঠিক তেমনই সত্য যে, প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধিক প্রতিভা বাংলা ছোট গল্পের শরীর সীমায় চেনা জীবনকে নতুন রূপের অবয়বে নতুন করে উপভোগ করার আধুনিক বৈচিত্র্য দান করেছে এই অর্থে তিনি আধুনিক গল্প কলার পথিকৃৎ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। প্রমথ চৌধুরী' -'প্রবন্ধ সংগ্রহ'-বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ কলিকাতা ১৯৬৮ ইং প্রবন্ধ 'সবুজপত্রের মুখপত্র'- পৃঃ৪৫

২। শ্রীভূদেব চৌধুরী' 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'-মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১৯৬২ ইং পৃঃ-২৭৩

৩। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের এক'শ বছর' (১৮৯১-১৯৯০) দে'জ পাবলিশিং-কলিকাতা-১৯৯৫, ইং পৃঃ-১৬৫

৪। ডঃ ইন্দ্রানী চক্রবর্তী-'বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ', রত্নাবলী ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-১৯৯৪ ইং পৃঃ৪৬

৫। রথীন্দ্রনাথ রায়-'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'-জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রোড, কলিকাতা দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৬৯ পৃঃ১১৭

৬। 'কালের পুত্তলিকা', প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৭

৭। প্রবন্ধ 'সবুজপত্রের মুখপাত্র'-পৃঃ ৪৬

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-চিঠি পত্র-পঞ্চম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণ কুমার মুখোপধ্যায়, কালের প্রতিমা, ১৯৭৮ কলকাতা

২. অরুণ কুমার মুখোপধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০), কলকাতা

৩. আনিসুজ্জমান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা

৪. আনোয়ার পাশা, সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, ১৩৭৬, ঢাকা

৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন, ১৯৭৬, ঢাকা

৬. আবুল কাসেম, ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম. ১৯৭২, ঢাকা

৭. আবুল ফজল, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, ১৯৬৮, ঢাকা

৮. আহমদ ছফা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা, ১৯৭৭, ঢাকা

৯. আহমদ শরীফ, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা, ১৯৬৯, ঢাকা

১০. খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-৭০), ১৯৯৭, কলকাতা

১১. গোলাম মুরশিদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, ১৯৭১. ঢাকা

১২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি, ১৯৮১, ঢাকা

১৩. নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, কলকাতা

১৪. ফরিদা সুলতানা, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা, ১৯৯৯, ঢাকা

১৫. ভূঁইয়া ইকবাল, বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-৭১), ১৯৯১, ঢাকা

১৬. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, ১৯৯৭, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১৭. রফিকউল্যাহ্ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭, ঢাকা

১৮. শিশির কুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩), ১৯৯৫, কলকাতা

১৯. সরদার ফজলুল করিম, বাংলাদেশের রাজনীতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ১৯৭৫, ঢাকা

২০. সরদার ফজলুল করিম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, ১৯৭৫, ঢাকা

২১. সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, (১৯৭২-১৯৮৮), ১৯৯৫, ঢাকা

২২. হাসান আজিজুল হক, কথা সাহিত্যের কথকতা, ১৯৮২, ঢাকা

২৩. ডঃ সায়েদা বানু, বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ, ঢাকা

২৪. শ্রী ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'।

২৫. বঙ্গীন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

436787

১. অনীক মাহমুদ, শওকত ওসমানের কথা সাহিত্যে জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, উত্তরাধিকারপত্রিকা ত্রৈমাসিক, ১৩৫৮, ঢাকা

২. এ. কে. এম খায়রুল আলম, তাহির রায়হানের গল্প, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৩৮৬, ঢাকা

৩. নির্মলেন্দু গুণ, ছোটগল্প ঃ জীবনবোধের নিরিখ, পরিক্রমা সাহিত্যিকী, ১৯৬৮, ঢাকা

৪. মাহারুল ইসলাম, ছোটগল্প সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের ভূমিকা, সাহিত্যিকী, ১৩৭৫, ঢাকা

৫. রফিক উল্লাহ খান, হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা

৬. রাজিব হুমায়ূন, আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৯১ ঢাকা

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের ছোটগল্প-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা ছত্রিশ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা-সম্পা- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঢাকা

৮. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়- 'বাংলা ছোটগল্প এই সময়'-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা-পয়ত্রিশবর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা-সম্পা-মোঃ মনিরুজ্জামান, ঢাকা

৯. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, বিভাগোত্তর সাহিত্যে ছোটগল্প, পূবালী, ১৩৬৩, ঢাকা

১০. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহেনও, ১৯৫১, ঢাকা